নারীর কথা - ২

নারীর কথা

NARIR KATHA

THE HUNGER PROJECT

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট- বাংলাদেশ

নারীর কথা - ২

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত

সম্পাদনায়

ড. বদিউল আলম মজুমদার

৮ মার্চ, ২০০৭

THE HUNGER PROJECT

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

নারীর কথা-২
আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

সহযোগী সম্পাদক
নাছিমা আক্তার জলি

নির্বাহী সম্পাদক
ড. মোস্তাফিজুর রহমান

নির্বাহী সম্পাদকের সহযোগী
সরস্বতী রানী পাল

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০০৭
মুদ্রণে : ইনোসেন্ট, ১৩২, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

প্রকাশক: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
৩/৭ আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১১-২৬২২, ৮১২-৭৯৭৫, ফ্যাক্স : ৮১১-৬৮১২

Narir Katha - 2
(Collected writings on the occation of International Women Day)
First Published : March, 2007

Published by : The Hunger Project
3/7 Asad Avenue, Mohammadpur, Dhaka-1207
Tel: 811-2622, 812-7975 Fax: 811-6812
Web: www.thpbd.org, www.thp.org/Bangladesh

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট প্রস্তাব

ড. বদিউল আলম মজুমদার*

সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ৪৫টি আসন পরবর্তী ১৫ বছরের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে, যা সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর মধ্যে আনুপাতিক হারে ভাগ করার কথা। অষ্টম জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীসহ ৭ জন নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্য ছিলেন। সংরক্ষিত ও নির্বাচিতসহ মেট ৫২ জন নারী সংসদ সদস্য প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন অষ্টম জাতীয় সংসদে, যা মোটেও সন্তোষজনক নয়। সংসদে নারীদের প্রকৃত ও যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য আমরা এই প্রবন্ধে একটি বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করছি।

নারী প্রতিনিধিত্ব কেন জরুরি?

মূলত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কারণে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব জরুরি। প্রথমত, নারীর জন্য সমতা ও সম-সুযোগের নিশ্চয়তা তথা তাদের মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার জন্য সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল কথাই হলো, সরকারি ক্ষমতার বৈধতার উৎস জনগণের সম্মতি। ফলে সত্যিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের জন্য প্রয়োজন সকল নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ শুধুমাত্র গোষ্ঠী বিশেষের নয়। এমন শাসন ব্যবস্থায় সর্বাধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠীর মতামত, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। নারীরা আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক। তাই নামমাত্র অংশগ্রহণ বা উল্লেখযোগ্য নারী প্রতিনিধিত্বহীন শাসন কাঠামোকে কোনোভাবেই গণতান্ত্রিক বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না। একারণেই আমাদের সংবিধানে

---

* গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ এবং সভাপতি, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম

[১০, ১৯(১) ও ২৮(২)] নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়ে জোরালো অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, দারিদ্র্য ও দারিদ্র্যের ভয়াবহ পরিণতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব তথা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন জরুরি। আমাদের জনসংখ্যার অন্তত ৪০ শতাংশ দরিদ্র্য। নারীরা দরিদ্র্যদের মধ্যে দরিদ্র্যতম। দুর্ভাগ্যবশত নারীদের মধ্যে বিরাজমান দারিদ্র্যই সার্বিক জাতীয় দারিদ্র্যের উৎস।

নারীদের মধ্যে বিরাজমান দারিদ্র্য অপুষ্টির একটি ভয়াবহ দুষ্টচক্র (insidious cycle of malnutrition) সৃষ্টির মাধ্যমে সার্বিক দারিদ্র্যের অবস্থাকে টিকিয়ে রাখে। আমাদের শিশুদের এক-তৃতীয়াংশ স্বল্প ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যা পৃথিবীতে প্রায় সর্বোচ্চ। জন্মকালে স্বল্প ওজনের ছেলে এবং মেয়ের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ফলে কন্যাশিশুরা জন্মের পর থেকেই বৈষম্যের শিকার হয়। তাদেরকে অপেক্ষকৃত কম খাবার দেওয়া হয় এবং কম যত্ন নেওয়া হয়। ফলে বাল্যকাল থেকেই কন্যাশিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার তুলনামূলকভাবে বেশি দৃশ্যমান। বয়স বাড়ার সাথে সাথে গ্রামীণ সমাজে অনেক মেয়েরা চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাদেরকে গৃহস্থালির কাজে জড়িত করা হয়। তাদেরকে শিক্ষা এবং মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত করা হয়। বয়ঃসন্ধিক্ষণে তাদের অনেককেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। নিজেদের শরীর পূর্ণভাবে বিকাশের আগেই তারা গর্ভবতী হয়ে পড়ে। এই সকল অল্পবয়স্ক এবং অপুষ্ট কিশোরীরাই স্বল্প ওজনের শিশুর জন্ম দেয়। এভাবেই অপুষ্টির দুষ্টচক্রের সৃষ্টি হয়। অপুষ্টির এই দুষ্টচক্রের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় আমাদের দেশের নারীদের, বিশেষত গ্রামীণ নারীদের ক্রমাগতহারে উচ্চতা হ্রাসে। এ দুষ্টচক্রের উৎস মূলত নারীর প্রতি বৈষম্য। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নারীরা অধস্তন, তারা ন্যূনতম সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং ক্ষমতাহীন। তাই আমাদের সমাজে এই দুষ্টচক্র নগ্নভাবে বিরাজমান। ১৯৯৬ সালের ইউনিসেফ-এর এক সমীক্ষা অনুযায়ী, "দক্ষিণ এশিয়ার অপুষ্টির মূলে রয়েছে নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান ব্যাপক অসমতা।"

পুষ্টিহীনতার দুষ্টচক্র জনগণের সার্বিক স্বাস্থ্য মানে অবনতি ঘটায় এবং তাদের উৎপাদনক্ষমতা ব্যাহত করে। ফলে দারিদ্র্য স্থায়ী রূপ লাভ করে। স্বল্প ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করা এবং অপুষ্টি নিয়ে বেড়ে ওঠা শিশুরা দীর্ঘমেয়াদী ও পৌনঃপুনিক ক্ষুধায় (chronic persistent hunger) ভোগে। তারা শারীরিক এবং মানসিকভাবে দুর্বল হয়। পরিণতিতে তাদের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়ফলে, ১৯৯৮ সালে ইউনিসেফ-এর এক হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশ পরবর্তী ১০ বছরে ২৩ বিলিয়ন ডলার পরিমাণ উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হবে। এ বঞ্চনাই আমাদের দেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে স্থায়ী করার অন্যতম কারণ। এছাড়াও নারীর প্রতি বঞ্চনার কারণে সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞানীরা ফিটাল প্রোগামিং (fetal programming) বা ভ্রূণ থেকে মানুষের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য নির্ধারিত হওয়ার কথা বলছেন। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, স্বল্প ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণকারী শিশুরা পরবর্তী জীবনে অধিকহারে হৃদরোগ ও বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশের জনগণের জন্য এটি যেন 'গোদের ওপর বিষফোড়া'! কারণ আমাদের অধিকাংশ জনগণই বাস করে দারিদ্র্যসীমার নিচে অতিরিক্ত চিকিৎসা ব্যয় তাদের সামর্থ্যের বাইরে।

পুষ্টিহীনতার দুষ্টচক্র ভাঙ্গতে এবং ফিটাল প্রোগামিং-এর ভয়াবহ পরিণতি এড়াতে হলে, নারীর প্রতি সকল বৈষম্যের অবসান ঘটানো এবং তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতি-নির্ধারণ করা জরুরি। এর জন্য প্রয়োজন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, যার ফলে তাদের মতামত ব্যক্ত করার অভিজ্ঞতা বিনিময়ের এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অধিক অংশগ্রহণের ফলে নারীর বিষয়ে ও তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহ জাতীয় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসবে। যার ফলে রাজনৈতিক অঙ্গনে সকলকে, বিশেষত নারীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার (রহপষঁংরাব) সুযোগ সৃষ্টি হবে।

চতুর্দশ সংশোধনীর দুর্বলতা

চতুর্দশ সংশোধনীর অনেকগুলো মৌলিক দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমত, ৩৪৫টি আসনের মধ্যে মাত্র ৪৫টি (বা ১৩ শতাংশ) আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে, যা অত্যন্ত অপ্রতুল। উল্লেখ্য যে, ৭ম সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ছিলো ৩০টি, অর্থাৎ ৯ শতাংশ। তাই এ

কথা অনস্বীকার্য যে, চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদে নারীর অর্থবহ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হওয়ার পরিবর্তে, নারী আসন আবারো টোকেনে (token) পরিণত হয়েছে। সত্যিকারভাবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পরিবর্তে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নারীদের প্রতি নীতি-নির্ধারকদের করুণার মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, যা বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামোকে আরো শক্তিশালী করবে। দ্বিতীয়ত, বর্তমানের এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ আসনের সদস্য ও সংরক্ষিত নারী সদস্যের মধ্যে দায়িত্বের বিভাজন করা হয় না। ফলে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে কাকে দায়বদ্ধ করা হবে– পুরুষ না নারী সদস্যকে– সে সম্পর্কে ভোটাররা নিশ্চিত হতে পারবে। এমনকি এক্ষেত্রে নারী সদস্য নিজেও তার দায়বদ্ধতা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল নন। তৃতীয়ত, সরাসরি নির্বাচনের পরিবর্তে দল কর্তৃক নির্ধারিত (selected) হওয়ার পদ্ধতি নারীকে রাজনীতির মূলধারা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখছে, যা ইতোমধ্যে প্রতীয়মান হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে তাদেরকে প্রান্তিক, প্রতীকী ও ক্ষুদ্র কার্যক্রমে জড়িত করা হচ্ছে– যেমনটি ঘটেছে স্থানীয় সরকারের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে। চতুর্থত, সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটারদের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ না থাকায়, নারী প্রার্থীদের যোগ্যতার বিবেচনা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে দলের নেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা আর লবিংই প্রার্থীর যোগ্যতার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়, যা ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। পঞ্চমত, চতুর্দশ সংশোধনী বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কর্তাব্যক্তিদের হাতে একটি বাড়তি সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে দলের রাঘব-বোয়ালরা তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে সংসদ সদস্য তৈরি করতে পারছে। পরিণতিতে পরিবারতন্ত্র আমাদের ওপর মারাত্মকভাবে জেঁকে বসার সুযোগ পাচ্ছে। সকল ন্যায়-নীতিকে অগ্রাহ্য করে 'সব কিছুই হবে বিজয়ীদের করায়ত্ব' (winners-take-all)– এমন সংস্কৃতির নগ্নচর্চা আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে ইতোমধ্যে বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের নেতা বাছাই করার ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদানের আর একটি হাতিয়ার ব্যবহার আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে মঙ্গল বয়ে আনছে না। এছাড়াও দলের উচ্চ মহল কর্তৃক নারী সংসদ সদস্য নির্বাচনের এ পদ্ধতি বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিকতাকে আরো প্রকট করে তুলেছে। সর্বোপরি, চতুর্দশ

সংশোধনীর মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তটি অতীতের মতো তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রকৃত নারী নেত্রী তুলে আনতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে- এমন নেতৃত্ব যারা ভবিষ্যতে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা করে নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসতে পারবেন। ইতোমধ্যে সৃষ্ট উপরিউক্ত সমস্যাগুলোর কারণে চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তটি নারীকে ক্ষমতায়িত করার পরিবর্তে তার বিপরীত ফলাফল বয়ে আনতে শুরু করেছে।

একটি বিকল্প প্রস্তাব

সংরক্ষণ ব্যবস্থা সাধারণত সংখ্যালঘুদের স্বার্থে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে নারীরা সংখ্যালঘু নয়। তাই সংরক্ষণ পদ্ধতি তাদের জন্য যথাযথ নয়। অধিকন্তু এটি নারী সমাজের জন্য একটি অমর্যাদাকর ব্যবস্থা। এছাড়াও নারীরা জনসংখ্যার অর্ধেক হওয়ায় সংসদে ৫০ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব তাদের ন্যায্য অধিকার। এমতাবস্থায় সংরক্ষণ পদ্ধতিকে একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। সকল দিক বিবেচনা করে সংসদে নারীর ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করার জন্য আমরা একটি বিকল্প ঘূর্ণীয়মান ব্যবস্থার (rotating system) প্রস্তাব করছি। আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী, সংসদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং তারা সরাসরিভাবে নির্বাচিত হবেন। একই সাথে নারীদের সাধারণ আসনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ থাকবে।

আমাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদের সব আসনগুলোকে লটারী বা অন্য কোন উপায়ে ৩ ভাগে ভাগ করা হবে। প্রথম পর্বে এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই আসনগুলোতে শুধু মাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং তারা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। দ্বিতীয় পর্বে, উক্ত সংরক্ষিত আসনসমূহকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং বাকি (অ-সংরক্ষিত) দুই-তৃতীয়াংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হবে। এরা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।

একইভাবে, তৃতীয় দফায়, অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ আসনে নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। এই ঘূর্ণীয়মান প্রক্রিয়াটি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত

চলবে। এই প্রক্রিয়ায় নারীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ নির্বাচনী এলাকা প্রয়োজন ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে।

আমাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে সকল উন্মুক্ত তথা অ-সংরক্ষিত আসনে নারীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। এ প্রক্রিয়ায় যোগ্য নারীরা পরবর্তী নির্বাচনে পুরুষদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হতে পারবেন। ফলে জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব এক-তৃতীয়াংশ ছাড়িয়ে আমাদের প্রত্যাশিত অর্ধেকে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে।

প্রস্তাবিত ঘূর্ণীয়মান প্রক্রিয়ার অনেকগুলো আর্কষণীয় দিক রয়েছে। প্রথমত, এটি নারী নেতৃত্ব সৃষ্টির একটি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে নারীরা নির্দিষ্ট একটি এলাকা থেকে নির্বাচন হয়ে এটিকে ভবিষ্যতে তাদের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ পাবেন। আমাদের প্রস্তাব গৃহীত হলে তিন পর্বে প্রতিটি আসন থেকে একজন করে অন্তত ৩০০ নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসবেন। এতে করে একদল বলিষ্ঠ নারী নেতৃত্ব সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হবে, যারা এক পর্যায়ে পুরুষদের সাথে সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হতে পারবেন। এভাবে এমন একদিন আসবে যখন নারীদের জন্য সংসদে আসন সংরক্ষণের প্রয়োজনও হবে না। দ্বিতীয়ত, প্রস্তাবিত প্রক্রিয়ায় সাধারণ আসনের সদস্য ও সংরক্ষিত নারী সদস্যের মধ্যে দায়িত্বের বিভাজন থাকবে। ফলে নারী সদস্যগণ তাদের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবেন। মনোনয়ন পাওয়ার জন্য তারা দলীয় কর্তা ব্যক্তিদের কাছে নিজেদের দায়বদ্ধ বলে মনে করবেন না। এতে করে তাদের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকা থাকবে এবং তারা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ হবেন, যা হবে সংসদীয় গণতন্ত্রের মৌলিক নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তৃতীয়ত, আমাদের প্রস্তাবটি সরাসরি নির্বাচনের মতো গণতান্ত্রিক নীতির সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। উভয়ের ক্ষমতা ও দায়িত্বও সমান থাকবে। যার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) গণতন্ত্র নিশ্চিত হবে।

চতুর্থত, আমাদের প্রস্তাবে 'নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা' (electability) প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। দলীয় হাই কমান্ডের সাথে লবিং করার প্রবণতা হ্রাস পাবে। এ অবস্থায়

দলগুলো সর্বাধিক যোগ্য প্রার্থীকে খুঁজে বের করবে, যারা তাদের আসনটির দলের জন্য ভবিষ্যতে ধরে রাখতে পারবেন।
চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বলা যায়, যেহেতু নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা (বষবপঃধনরষরঃু) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচিত হবে, তাই নারী আসনগুলোকে ফায়দা দেওয়ার হাতিয়ার (ঢ়ধঃৎড়হধমব ঃড়ড়ষ) হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ কমে যাবে। এতে করে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি দুর্নীতিমুক্ত হবে এবং আমরা পরিবারতন্ত্র থেকে রক্ষা পাব বলে আশা করা যায়।

তবে শুধুমাত্র সংসদে নারীর উপস্থিতিই তার প্রকৃত ও কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। নারী প্রতিনিধিদের তাদের বক্তব্য ও মতামত স্পষ্ঠভাবে তুলে ধরার সুযোগ ও স্বাধীনতা থাকতে হবে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে বর্তমান অবস্থায় যা সম্ভব নয়।

উপসংহার

বিরাজমান ব্যাপক দারিদ্র্য ও অপুষ্টি অর্থাৎ পৌনঃপুনিক ক্ষুধার সমস্যা স্থায়ীভাবে দূর করতে হলে আমাদের অবশ্যই নারীদের ক্ষমতায়িত করতে হবে, তাদের জন্য সমতা নিশ্চিতকরণ ও সুযোগ সৃষ্টি করার পথ খুঁজে বের করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন– রাজনৈতিক অঙ্গনে তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পৃক্তকরণ। যাতে তারা তাদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পান এবং তাদের চিন্তা-চেতনা নীতি-নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারেন। জাতীয় সংসদে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হলে এক্ষেত্রে সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর পদক্ষেপ হবে।

সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছানোর এবং এ আলোচনাকে আরও ফলপ্রসূ ও সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে আমরা এ নিবন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন করেছি। আমাদের প্রস্তাব অনেকের বিশেষত, স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের কাছে 'বিপ্লবী' বলে মনে হতে পারে। আমাদের প্রস্তাবের বিপক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো হবে এবং পুরুষ সদস্যরা তাদের আসন হারানোর ভয়ে এটিকে কোনোভাবেই মেনে নিতে সম্মত হবেন না। কিন্তু সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা কারো জন্মগত অধিকার

নয়। কিংবা কাউকে তা ইজারা দেয়া হয় নি। এছাড়াও পৃথিবীর অনেক দেশে এখন আইন পরিষদের সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব করার সময়সীমা (term-limits) বেঁধে দেয়ার প্রচেষ্টা চলছে।

আমাদের প্রস্তাবটিকে অনেকে বাস্তবতা বিবর্জিত বলে আখ্যায়িত করতে পারেন। এমনকি যারা সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বাড়ানোর পক্ষে তারাও এটিকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিতে পারেন। হ্যাঁ, বিদ্যমান বাস্তবতায় এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করার প্রস্তাব অনেকের কাছেই অবাস্তব বলে মনে হতে পারে। যারা এমন ধারণা পোষণ করেন, তাদেরকে আমরা দোষারোপ করতে পারি না। কারণ এক সময়ে নারী ভোটাধিকার অর্জনের দাবিও ছিল অনেকের কাছে অবাস্তব ও অযৌক্তিক। এমনিভাবে আমরা সে জননীকেও দোষারোপ করতে পারি না, যে তার গর্ভজাত কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তান চেয়ে কম খাবার দেয়, কম যত্ন করেন। নিঃসন্দেহে সে তার কন্যাসন্তানকে পুত্র সন্তান থেকে কম ভালোবাসে না। তবুও সে কন্যার প্রতি অবচেতনভাবে বৈষম্যমূলক আচরণ করে। এর কারণ হলো পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি, যে সংস্কৃতিতে সে বড় হয়েছে, যা তার রক্ত মাংসের সাথে মিশে গেছে এবং যা তার আচরণকে প্রভাবিত করে। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় কন্যাশিশুরা পুত্রশিশুদের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। এমনিভাবে পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির কারণেই অনেকে, এমনকি অনেক নারীও সংসদে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধিত্বের কথা কল্পনা করতে পারেন না– অর্ধেকের তো প্রশ্নই আসে না। অথচ সমগ্র জাতির সুস্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, মর্যাদাবোধ ও আত্মনির্ভরশীলতা নির্ভর করে নারীর প্রতি বৈষম্যের অবসান এবং তার রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ওপর।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোনো পদ্ধতি চূড়ান্তভাবে ত্রুটিমুক্ত নয়। যে কোন পদ্ধতির কার্যকারিতা নির্ভর করে বাস্তবায়নকারী সংস্থা বা ব্যক্তির সততা ও আন্তরিকতার ওপর। আমাদের প্রস্তাবিত প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা নির্ভর করবে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের সৎ ও বলিষ্ঠ অঙ্গীকার এবং তাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর। এছাড়াও রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজ স্বার্থে আঘাত লাগলে 'খেলার' মাঝখানে নিয়ম পরিবর্তনের বদলে খেলার পূর্বনির্ধারিত নিয়ম মেনে চলার ব্যাপারে

অভ্যস্ত হতে হবে। অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সংস্কৃতিও তাদেরকে চর্চা করতে হবে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসঃ অধিকার আদায়ের চেতনা

নাছিমা আক্তার জলি*

ইতিহাসের পাতা উল্টালেই যে সকল ঘটনা আমাদের মনে নাড়া দেয় তার অন্যতম একটি ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্কের রাজপথে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন। নারী শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ আন্দোলন সূচিত হয়েছিল। সেদিন নিউইয়র্কের একটি সূচ কারখানায় নারী শ্রমিকরা তাদের কাজের সময় ৮-৫টা নির্ধারণ, কাজের স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ পরিবেশ, সমান কাজে সমান মজুরি, দিবা শিশুযত্ন কেন্দ্র (উধু পধৎব পবহঃৎব), প্রসূতিকালীন ছুটি ইত্যাদি দাবিতে রাজপথে নেমে এসেছিলেন। তবে নারী শ্রমিকদের ঐ আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী নারী শ্রমিকদের উপর চালায় অমানুষিক পুলিশী জুলুম-নির্যাতন। এমনকি এসব নারী আন্দোলনকারীদের কারাগারেও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্ত তা সত্ত্বেও তৎকালীন শাসক-শোষকগোষ্ঠী তাদের দাবিয়ে রাখতে পারেন নি। বরং নারী সমাজ ক্রমাগত সংঘবদ্ধ হয়েছে। মেক্সিকো, কোপেনহেগেন, নাইরোবী, কায়রো, বেইজিংসহ বিশ্ব ফোরামগুলোতে অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সমবেত হয়েছেন সেই মহীয়সী নারীরা। এ সকল লড়াই সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৮৬০ সালে নারী শ্রমিকরা নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে ১৮৮৯ সালে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির অন্যতম নেত্রী ক্লারা জেটকিন আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সম্মেলনে নারী সমাজের অধিকারের প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। ১৯০৮ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্কের দর্জি কারখানার নারী শ্রমিকরা ভোটাধিকারের দাবিতে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় ১৯১০ সালে নারীরা ভোটাধিকার প্রাপ্ত হন। এখান থেকেই শুরু হয় নারীর অধিকার আদায়ের সফল অগ্রযাত্রা। অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর ইউরোপের জার্মানিতে নারীর ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার পর একই বছর জার্মানির ষ্টুটগার্ডে সমাজতান্ত্রিক দ্বিতীয় নারী সম্মেলনে ৮ মার্চকে নারী দিবস হিসেবে পালনের আহ্বান

---

* প্রোগ্রাম ম্যানেজার, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ এবং সম্পাদক, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম

জানানো হয়। এ আহ্বান শুধু জার্মান নারীদের জন্যই ছিল না, ছিল বিশ্বের সমগ্র নারী সমাজের প্রতি। কেননা, বিশ্বের সকল নারীর অবস্থা ও অবস্থান তুলনামূলক বিচারে প্রায় একই। গৃহে তাদের অধঃস্তন অবস্থা, কর্মক্ষেত্রে মালিকের শোষণ, সমান শ্রম ও সময় বিনিয়োগ করার পরও কোন কোন ক্ষেত্রে সমান মজুরি না পাওয়া। নারীর প্রতি এ সকল অসমতা ও বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিহত করে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল নারী সম্মেলনের মূল লক্ষ্য। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে নারীকে সোচ্চার করে তোলাই ছিল ঐ সম্মেলনের উদ্দেশ্য। মূলত: এ সকল চেতনাকেই ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

১৯১০ সালে এ দিনটি নারী দিবস ঘোষণা হওয়ার পর ১৯১১ সালে জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড ও আফ্রিকায় প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। এরপর ১৯১৪ সাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ বিপ্লব শোষণহীন এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ উন্মোচন করে। ফলে নারী সমাজের জন্য সৃষ্টি হয় এক নতুন দিগন্ত। নারীরা ভোটাধিকার প্রাপ্ত হন, সমান মজুরি প্রথা চালু হয়। কাজের সময় ৯-৫ টা নির্ধারিত হয় ইত্যাদি। সবার জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রসারের কর্মসূচিসহ নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু হয়। পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সোভিয়েত সরকার ৮ মার্চকে ছুটি হিসেবে ঘোষণা করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন রাষ্ট্র প্রধানের এই পদক্ষেপই মূলত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৮ মার্চকে নারীদের অধিকার আদায় ও রক্ষায় অর্থবহ করে তোলে ও প্রেরণা যোগায়। আন্তর্জাতিক পরিসরে শুরু হওয়া নারী অধিকার আদায়ের আন্দোলনের হাওয়া স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশেও লাগে। রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়া বাংলাদেশেও নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। যদিও সে সময় আন্তর্জাতিক নারী দিবস; আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল

চেতনা (ংঢ়রৎরঃ) সম্পর্কে এদেশের মানুষের তেমন কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের মধ্যে প্রবল স্নায়ু যুদ্ধ, সদ্য সমাপ্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ইত্যাদির কারণে বিশ্বশান্তির সংগ্রামই ছিল তখনকার সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। তৎকালীন বিশ্বে নারী আন্দোলনের মূল শ্লোগান হয়ে উঠে 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই'।

সে সময় বাংলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রীর আমন্ত্রণে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফরে আসেন। এই প্রতিনিধি দলে মাদাম সুকোরভা নামে একজন নারী প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি এদেশের নারী নেত্রীবৃন্দের সাথে ৮ মার্চের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। এরপর ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ৮ মার্চ উদ্‌যাপিত হয়। ৮ মার্চ উপলক্ষে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পক্ষ থেকে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫টি দৈনিক পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় পাতার শেষ কলামে ৮ মার্চ সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এরপর পরবর্তী বছরগুলোতে খুব ছোট ছোট পরিসরে বেসরকারি সংস্থাগুলোর উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মধ্য দিয়ে দিবসটি উ্যাপিত হতে থাকে।

১৯৮৪ সালে জাতিসংঘ তার সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের আহ্বান জানায়। তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশের অনেকগুলো বেসরকারি সংস্থা দিবসটি পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় এবং বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। ধীরে ধীরে ৮ মার্চ পালনের চেহারা বদলাতে শুরু করে। দিবসটিকে ঘিরে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালায় যুক্ত হতে থাকে নতুন নতুন মাত্রা।

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৭ দফা দাবি নিয়ে ১৯৮৬ সালে গঠিত হয় 'ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ'। এ সময় থেকে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার চেতনাকে শাণিত ও মজবুত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কর্মসূচিতে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, সমাবেশ, লিফলেট, পোস্টার, দৈনিক পত্রিকায়

ক্রোড়পত্র প্রকাশসহ নানা ধরনের মাত্রা যুক্ত হয়। বর্তমানে এ দিবসটি নারী সমাজের জন্য একটি ভিন্নধর্মী তাৎপর্য বহন করে চলছে।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে এ উপমহাদেশে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার আন্দোলনে নারীরা ক্রমাগত ভূমিকা পালনের সাথে সাথে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও ধারাবাহিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সামন্তবাদ ও ঔপনিবেশিক শোষণ, পীড়ন, বঞ্চনার বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিনিয়ত যেমন লড়াই করেছে, তেমনিভাবে পাশ্চাত্য নবজাগরণও জনসাধারণের মধ্যে সমাজ সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলেছে। একই সঙ্গে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের নারীরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সমানতালে এগিয়ে যাচ্ছে। এই দিবসটির চেতনা বিশ্বের সব নারীকে অন্তত নারী অধিকার আদয়ের আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ করেছে। ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সার্থকতা এখানেই। নারী মুক্তির এ আন্দোলনে বর্তমানে কেবল নারীরাই লড়ছে, তা নয়। অনেক পুরুষও আছে; যারা এ লড়াইয়ের বলিষ্ঠ সৈনিক। আমাদের বিশ্বাস, নারী-পুরুষের সম্মিলিত চেষ্টায় সমগ্র বিশ্বসহ বাংলাদেশেও নারীর প্রতি বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান হবে, সমতার ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। ৮ মার্চ, ২০০৭ সালে বাংলাদেশের নারী সমাজের এই হোক প্রত্যাশা।

বিউটিঃ মাথা তুলে দাঁড়ানো এক নারী

আবুল বাশার

আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর কাঁধে চাপানোর জন্য কতকগুলো সিদ্ধান্ত আলো বাতাস বিহীন অবস্থায় বাক্সবন্দি করে রাখা হয়েছে। এসব অস্বাস্থ্যকর সিদ্ধান্ত নারীর ওপর চাপানোর চর্চা চলছে নারীর 'কল্যাণে'র জন্য। এ 'নারীকল্যাণ' চর্চা করছি আমরা নারী পুরুষ নির্বিশেষে। কল্যাণের উদ্দেশ্যে আমরা অকল্যাণ সাধন করে চলেছি নারীর সেই ঐতিহাসিক পরাজয়ের কাল থেকে। মহামতি দার্শনিক ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলছি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নারীকে উৎপাদকের আসন থেকে সরিয়ে পুনরুৎপাদনের যন্ত্র বানানো হয়েছে। যে সমাজ নারীর উৎপাদকের মর্যাদা ছিনতাই করেছে, সেই সমাজ সভ্যতার বিকাশ ঘটালেও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে আপাদমস্তক ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থতার এই দায়ভার একা 'পুরুষের' নয়, নারীরও। এই ব্যর্থতাকে আমরা সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে সামাজিক সত্যে (Social fact) পরিণত করেছি।

ঐতিহাসিক কাল থেকে নারীকে 'অবলা' বানিয়ে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে সমাজ। এই সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ বলি হচ্ছেন নারীরা। আর এই ফল ভোগ করছে গোটা সমাজ। পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ আশ্রিত এমন এক সিদ্ধান্তের শিকার শাহীন আক্তার বিউটি। চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানার মাসনিগাছা গ্রামে ১৯৬৯ সালের ৪ এপ্রিল এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বিউটি। সবুজে ঢাকা গ্রামের নিষ্পাপ প্রকৃতির মতো শৈশব কেটেছে তার। ধুলোমাখা পথ ধরে হৈ চৈ করতে করতে স্কুলে যেতেন বিউটি। মাসনিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পাশ করে সোনাইমুড়ী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

ভর্তি হন। এ স্কুল থেকে ১৯৮৪ সালে এসএসসি পাশ করে চট্টগ্রামে বোনের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন বিউটি। দুলাভাইয়ের এক বন্ধু তার শ্যালক মাহবুবুর রহমানের সঙ্গে বিউটির বিয়ের প্রস্তাব দেন। বিউটির দুলাভাইও রাজি হয়ে যান। যার সঙ্গে যার বিয়ে তাদের মতামত না নিয়েই উভয় পরিবার বিয়েতে রাজী হয়ে যায় এবং ১৯৮৫ সালের ২৩ আগস্ট বিউটিকে মাহবুবুর রহমানের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। ছোটকাল থেকেই বিউটিকে মেয়ে হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। তাই বিউটি কোনো মতামত দিতে পারে নি। জড় বস্তুর ন্যায় বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলো সেই কিশোরি বিউটি। বিয়ের পর চট্টগ্রামে শ্বশুরবাড়িতে পাঠানো হয় বিউটিকে। স্বামী মাহবুবুর রহমান লিভার ব্রাদার্স-বাংলাদেশ লিমিটেডে চাকরি করতেন। স্বামী অফিসে চলে যাওয়ার পর প্রতিদিন শাশুড়ি-ননদ মিলে সংসারের গাদা গাদা কাজ চাপাতেন বিউটির ওপর। সংসারের কাজে অভ্যাস না থাকায় দক্ষতার সঙ্গে বিউটি সব কাজ করতে পারতেন না। আর এতে তার ওপর নেমে আসতো নির্যাতনের কালো মেঘ। পড়ালেখা করানোর প্রতিশ্রুতি থাকলেও শ্বশুর-শাশুড়ি সে প্রতিশ্রুতি আর রক্ষা করেন নি। বরং উল্টো কাজের চাপে কাহিল করে রাখতো বিউটিকে। নববধূর অমোঘ দায়িত্ব যেন শ্বশুরালয়ে জমে থাকা কর্ম সম্পাদন। একে তো পড়ালেখা বন্ধ হওয়ার বেদনা আর বাড়িতে কাজের চাপ সব মিলিয়ে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করেত থাকেন বিউটি। প্রতিবাদহীন কষ্টভোগ যেন নারীর ললাট লিখন। বিউটি জানান, স্বামী মাহবুবুর রহমান তখন তার প্রতি খুব একটা মনোযোগী ছিলেন না। কারণ, তারও সাঁয় ছিলো না এই বিয়েতে। ফলে স্বামীর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে না উঠায় তাকেও কাছের লোক মনে হয় নি বিউটির। যৌথ পরিবারে বিউটি তাই একা সব যন্ত্রণা ভোগ করে চলছিলেন। নিজের বাবা-মাকেও একথা জানাতে পারতেন না। কারণ, সমাজ-পরিবার তাকে শিখিয়েছে নারীকে সব কষ্ট সহ্য করতে হয়। এভাবে দু'মাস কাটানোর পর শ্বশুরবাড়ির সিদ্ধান্তে সংসারের কাজ শেখানোর জন্য ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে ননদের বাড়ীতে পাঠানো হয় বিউটিকে। দুই বছর সেখানে থাকার পর তাকে আবার ফিরিয়ে আনা হয় শ্বশুরবাড়ি চট্টগ্রামে। শ্বশুরবাড়ি ফিরে আসার পর শারীরিক ও মানসিক চাপে অসুস্থ হয়ে পড়েন বিউটি। এ সময় বাবা এসে বাড়ীতে নিয়ে যান বিউটিকে। দীর্ঘ সাত মাস বাবা-মায়ের সেবায় সুস্থ হয়ে ১৯৮৭ সালে কুয়া ডিগ্রী কলেজে এইচএসসি-তে ভর্তি হন তিনি।

এক বছর পার হওয়ার পর স্বামী মাহবুবুর রহমান তাকে আবার চট্টগ্রামে নিয়ে আসেন। যন্ত্রের ন্যায় বিউটি যেন চালকের সিদ্ধান্তে কচুয়া থেকে চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম থেকে কচুয়া হয়ে আবার চট্টগ্রাম ফিরে আসেন।

স্বামী অফিসে থাকার সময় শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদের অত্যাচার সন্ধ্যার পর যখন অশ্রু হয়ে ঝরতো, তখন পরিবারের সবাই বলতেন, বউমাকে জিনে ধরেছে। এ অবস্থার ভেতর দিয়েও স্বামীর আনুকূল্যে ১৯৮৯-৯০ সালে নাসিরাবাদ এমইএস কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯৯২ সালে এইচএসসি পাস করেন বিউটি। একই কলেজে ডিগ্রী ভর্তি হয়ে পরীক্ষার আগ মুহূর্তে সন্তান প্রসবজনিত কারণে আর ডিগ্রী পরীক্ষা দেয়া হয় নি তার। শিক্ষা জীবন অসমাপ্তই রয়ে যায় বিউটির।

ঘুরে দাঁড়ান যেভাবে

শ্বশুরবাড়ীতে বিউটি যখন অত্যাচার নিপাড়ীনের মধ্যে দিন পার করছিলেন তখন সহপাঠি খালাত ভাই আবুল কালাম আজাদ তাকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরামর্শ দেন। সহপাঠী আবুল কালাম আজাদের পরামর্শ বিউটির মনে ধরে। পরামর্শ মোতাবেক বিউটি ১৯৯৩ সালে ভ্রাম্যমান দর্জি বিজ্ঞান কলেজ থেকে সেলাই-কাটিংয়ের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পারিবারিক নির্যাতন মোকাবেলার জন্য নারীকে কতকগুলো কৌশল অবলম্বন করতে হয়। বিউটি আপাও যে সেরকম শাশুড়ি-ননদের মন পাওয়ার জন্য শাড়িতে হাতের কাজ করে শাশুড়িকে উপহার দেন। ননদকে জামা বানিয়ে দেন। এতে যেন পরিবেশ পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূল হয়ে উঠে। ভ্রাম্যমান দর্জি বিজ্ঞান কলেজ থেকে প্রশিক্ষণ পরবর্তী কর্মকাণ্ড বিউটিকে আশাব্যঞ্জক সাফল্য দেয়ার পর তিনি 'নকশা ফ্যাশন' নামে একটি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে বিউটি স্বামী মাহবুবুর রহমানের কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয় নি তাকে। একে একে পরিবারের সব প্রতিকূলতাকে জয় করে নিজে স্বাবলম্বী হয়ে বর্তমানে এক সোনার সংসার গড়ে তুলেছেন বিউটি।

'নকশা ফ্যাশন'র সাফল্যের পর শাহীন আক্তার বিউটি ১৯৯৬ সালে চট্টগ্রাম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ব্লক বাটিকের ওপর যুব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামে যুব মেলায় বিউটির দোকানটি ১ম স্থান অধিকার করে। হস্তশিল্পের ওপর দু'টি প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর বিউটি মোটামুটি সাফ্যল্যের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তার ভেতর যে সমাজসেবামূলক কাজ করার সুপ্ত বাসনা ছিল তা কোনোভাবেই কাজে লাগাতে পারছিলেন না। নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য নারীদেরও স্বাবলম্বী করার প্রবল আগ্রহ নিয়ে তিনি মনে মনে পথ হাতড়াছিলেন। এমন সময় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে তাকে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ' পরিচালিত উজ্জীবক প্রশিক্ষণের কথা জানানো হয়। প্রশিক্ষণের আমন্ত্রণ পেয়ে বিউটি যেন সব কিছু ফেলে সেখানে ছুটে আসবেন। কারণ, প্রশিক্ষণই তাকে আলোর পথের সন্ধান দিয়েছে। ২০০৪ সালের আগস্ট মাসে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত ৫৩৩তম ব্যাচে তিনি উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। চারদিনের এই প্রশিক্ষণ যেন বিউটিকে পৃথিবীটাকে নতুন করে চিনিয়ে দেয়। সমাজের অসংলগ্নতা, তা দূর করার কর্মপদ্ধতি নারীর অবস্থান ও তার ক্ষমতায়ন কিভাবে সম্ভব সব কিছু তার সামনে নতুনভাবে হাজির হয়। নতুন আরেক পৃথিবীতে পদার্পন করেন বিউটি। বাস্তবসম্মত সব উদ্যোগ গ্রহণে তিনি প্রস্তুত হতে থাকেন। আরো গঠনমূলকভাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে 'নকশা ফ্যাশনের' নাম বদলিয়ে তিনি 'সূচনা' নামে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে এ সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করেন। রেজিস্ট্রেশন নিয়ে 'সূচনা' তার মতো অন্য নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য দক্ষতামূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দানের আয়োজন করে যাচ্ছেন। এ কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে 'ডড়সবহ ধহফ পযরষফ উবাবষড়ঢ়সবহঃ পবহঃৎব' নামে আরেকটি সংগঠন গড়ে তোলেন তিনি। এ সংগঠনটি ২০০৪ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রেশনভুক্ত হয়। উজ্জীবক প্রশিক্ষণ কিভাবে তাকে সাহসী করে তোলে এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিউটি জানান যে, "একসময় মনের অসহ্য কষ্টগুলো পর্যন্ত কাউতে জানাতে পারতাম না, মুখ বুঁজে সব সহ্য করতাম, অশ্রু দিয়ে লাঘব করতাম, উজ্জীবক প্রশিক্ষণে সবার সামনে মাইক্রোফোনে কথা বলা শিখেছি। উজ্জীবক প্রশিক্ষণ আমাকে কথা বলার ক্ষমতা ও সাহস দিয়েছে। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয় কিভাবে, তা শিখিয়েছে।" উজ্জীবক

প্রশিক্ষণকালীন অনুভূতি জানাতে গিয়ে তিনি অনেকটা আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, "প্রশিক্ষণে নারীর ক্ষমতায়ন পর্বটির কথা আমি কখনো ভুলবো না।"

এ প্রশিক্ষণ থেকে বিউটির মনে হয় সমাজের উন্নয়নের জন্য ব্যক্তির উন্নয়ন বিশেষ করে নারীর উন্নয়ন জরুরি। এজন্য সংগঠনের কোনো বিকল্প নেই। ফলে সাংগঠনিক কাজের প্রতি তিনি আরো বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তার বক্তব্য অনুসারে প্রশিক্ষণ তাকে আলোর সন্ধান দিয়েছে। তাই প্রশিক্ষণের সুযোগ এলেই তিনি তা গ্রহণ করেন। নিচে তার একটি ছক দেয়া হলো:

প্রশিক্ষণের নাম	**প্রশিক্ষণদানকারী প্রতিষ্ঠান**	**সাল**	**মেয়াদ**
সেলাই-কাটিং	দর্জি বিজ্ঞান কলেজ	১৯৯৩	৩ মাস
ব্লক-বাটিক	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	১৯৯৬	৩ মাস
লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট	"	২০০৩	১০ দিন
কম্পিউটার	"	২০০৩	৪ মাস
পোশাক তৈরি	"	২০০৪	৩ মাস
ব্লক প্রিন্টিং	"	২০০৪	৩ মাস
মৎস্য ও ছাগল পালন	"	২০০৪	১ সপ্তাহ
সমাজ ও গোষ্ঠী উন্নয়ন	"	২০০৪	১ মাস

এসব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিউটি এখন একজন পরিপূর্ণ স্বাবলম্বী সমাজসেবী। নিজে স্বাবলম্বী হয়ে নিজের সংসারকে যেমন করে তুলেছেন ছন্দময়, তেমনি আর দশজন নারীকে এ পথে আনার জন্য কাজ করে চলেছেন নিরন্তর। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির সংগঠন 'সূচনা'র মাধ্যমে নারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে চলেছেন বিউটি। 'সূচনা' ও 'Women and child Development'র ব্যানারে তিনি বাল্যবিবাহ

রোধ ও যৌতুক প্রথা বিরোধী প্রচারণাসহ নানান কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছেন।

একা একা কোনো কাজ করার চেয়ে সমন্বিতভাবে করলে তার ফল টেকসই হবে। এ ধারণা থেকে শাহীন আক্তার বিউটি স্থানীয় অন্যান্য সংগঠনগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে নারী অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কন্যাশিশু দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সম্মিলিতভাবে আলোচনা সভা, র‍্যালীসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে থাকেন। জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ÔWomen and child Development' এইচআইভি/এইডস, নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক উঠান বৈঠক ও আলোচনাসভাসহ প্রচারণাধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকেন। তিনি জানান 'সূচনা'র হ্যান্ডিক্রাফ্ট থেকে তার মাসিক গড় আয় প্রায় ১৫ হাজার টাকা। এছাড়া এসব কাজের মাধ্যমে তিনি ১৫ লক্ষ্য টাকা মূল্যমানের স্থায়ী সম্পত্তি গড়ে তুলেছেন।

সাজানো বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

যে অতীতের স্মৃতি উচ্চারণ করতে গিয়ে শাহীন আক্তার বিউটি এই প্রতিবেদকের সামনে ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠেছেন সেই অতীতের বেদনা ভুলে যেতে তিনি কঠোর পরিশ্রম করে বর্তমানকে করে তুলেছেন সাজানো-গুছানো। শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার নিপীড়নের ধকলে অসুস্থ হয়ে কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে যাওয়ায় তার গান করার স্বপ্ন উবে যাওয়ায় এখন তিনি সন্তানদের মাঝে তার বাস্তবায়ন দেখতে চান। অক্লান্ত পরিশ্রমে অর্জিত অর্থ দিয়ে তিনি তার সন্তানদের সংস্কৃতিমনা করে গড়ে তুলেছেন। সব সন্তানকেই তিনি শিক্ষক রেখে নিয়মিত সংগীত চর্চা করাচ্ছেন। এর সুফলও পেয়েছেন। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে মধ্যাহ্ন ভোজ পরবর্তী বড় মেয়েটি নুসরাত জেরিন শারমিন স্বার্ণা আমাদের গান গেয়ে শোনালেন। সে চলতি বছর (২০০৭

সাল) এসএসসি পরীক্ষার্থী। চট্টগ্রাম বেতারের নিয়মিত শিল্পী। ভালো ছবিও আঁকে। একমাত্র পুত্র সন্তান ওয়াসিউজামান পিপলু অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। সে তবলা বাজায়। দ্বিতীয় মেয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ইসরাত জেবিন আইরিন আন্না ও সবচেয়ে ছোটমেয়ে সাহজেবিন তন্নীও গান করে। ছবি আঁকায় সবাই প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছে। ৩য় শ্রেণির ছাত্রী সেই ছোট্ট মেয়েটি নিজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে আমাদের একটি সুন্দর ছড়াগান শোনায়। এই সাজানো বর্তমানে দাঁড়িয়ে শাহীন অক্তার বিউটি তার ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা জানালেন। পরিবারের অশান্তি দূর করার জন্য সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি ভবিষ্যতে হাসপাতাল, বৃদ্ধাশ্রম ও এতিমখানা গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে বলে বিউটি জানান।

শাহীন আক্তার বিউটি প্রচলিত সমাজের বেড়াজালে আটকে পথ হারিয়ে বসে থাকেন নি। তিনি অবিরাম পরিশ্রম করে আজ যেভাবে নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন, সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার কাজে অবিচল রয়েছেন আমরা সবাই তার মতো করে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে কাজ করলে আমাদের সমাজ পাল্টাতে হয়তো বেশি দিন লাগবে না।

জাগরণের অগ্রপথিক ফেরদৌসী

আবুল বাশার

প্রচলিত সমাজবাস্তবতাকে অজুহাত বানিয়ে বেশিরভাগ মানুষই যখন নিপীড়নমূলক মূল্যবোধ আর কূপমণ্ডূকতার কাছে আত্মসমর্পণ করে হাত গুঁটিয়ে বসে থাকে, তখন কেউ কেউ এ বেড়াজাল ভাঙ্গার প্রত্যয়ে সামনে এগিয়ে আসে। এটিও যেন প্রচলিত সমাজের অনিবার্য নিয়তি। সমাজ-সন্তানই নুয়ে পড়া সমাজকে সামনে এগিয়ে নিতে এর কুসংস্কার আর প্রতিকূলতার গোড়ায় আঘাত করে। এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে মানব সন্তানরা সমাজকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে এসেছে, আসছে। সামনেও এভাবে এগিয়ে যাবে সমাজ আর সমাজের সন্তানরা। কিন্তু এ দায়িত্ব সবাই নিতে চায় না। অনেকেই ব্যক্তিজীবনের অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আহত হয়ে বিষণ্ন-বিমর্ষ হয়ে পড়ে। হতাশ হয়ে প্রতিকূল সমাজের কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করে সমাজের পশ্চাৎপদতাকে শক্তিশালী করে রাখে। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বেগম রোকেয়ার মতো সময়ের সাহসী সন্তানরা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে 'না'। পর্বতপ্রমাণ বাঁধার সামনে দাঁড়িয়ে সমাজকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় তারা। তেমনিভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সমাজবাস্তবতাকে পাল্টানোর প্রত্যয়ে, পিছিয়ে পড়া সামাজিক মূল্যবোধকে জবাব দিতে ব্যক্তিজীবনের অপ্রত্যাশিত টানাপোড়েনের মধ্য থেকেও এগিয়ে এসেছেন চাঁদপুরের মোসাম্মৎ ফেরদৌসী বেগম।

ফেরদৌসী বেগমের অতীত ও বর্তমান

১৯৬৮ সালের ২ অক্টোবর ঢাকার মগবাজারে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। বাবা মোঃ তোফায়েল উদ্দীন ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। আট ভাই-বোনের মধ্যে পঞ্চম ফেরদৌসী বেগম ঢাকার রায়ের বাজার এলাকার রোটারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকে ১৯৮৭ সালে এসএসসি পাশ করেন তিনি। ইট-কাঠ-পাথরে ঢাকা শহরের সব জটিলতার সঙ্গে পরিচিত হতে না হতেই সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী থাকা অবস্থায় পারিবারিক সিদ্ধান্তে তৎকালীন প্রথম শ্রেণির ঠিকাদার মোঃ মহসীনের সঙ্গে বিয়ে হয় ফেরদৌসীর। বাবার বাসা থেকে এসএসসি পাশ করার

পর স্বামীর বাসায় পদার্পণ করেন তিনি এবং সিদ্ধেশ্বরী কলেজে মানবিক বিভাগে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হন। স্বামীর সংসারে থেকে পড়ালেখা চালিয়ে যান তিনি। পড়ালেখার মাঝে এক বছর বিরতির পর ১৯৯০ সালে ওই কলেজ থেকেই এইচএসসি পাশ করে একই কলেজে বিএ ক্লাসে ভর্তি হয়ে ১৯৯৩ সালে বিএ পাশ করেন। স্কুলে পড়ার সময় ১৯৮৫ সালে প্রথম এবং ১৯৮৭ সালে দ্বিতীয় ছেলে আসে তার কোলে। দু'সন্তান নিয়ে স্বামীর সংসারে বেশ ভালভাবে দিন কাটছিল তার।

১৯৯৩ সালের দিকে স্বামীর গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর জেলার হাইমচরে চলে আসেন ফেরদৌসী বেগম। বড় ছেলে মোঃ ফেরদৌস রনি তখন ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র। গ্রামে এসে উত্তর আলমী ইউনিয়নের কমলাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করান ছেলেকে। এভাবে মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাট দিন কাটছিল তার। কিন্তু ১৯৯৭ সালটি তার কাছে শোকের বছর হিসেবে আবির্ভূত হয়। ছোট ছেলে মোঃ ফরহাদ দীপু তখন তেজগাঁও সরকারী বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র। ঢাকা থেকে চাঁদপুর ফেরার পথে লঞ্চডুবিতে নিহত হয় সে। সন্তান হারানোর শোক সামলে উঠতে না উঠতেই ২০০২ সালে বড় ছেলের এইচএসসি রেজাল্ট হওয়ার পর স্বামী হার্ট স্ট্রোক করে পরপারে গমন করেন। স্বামী-সন্তান বিয়োগের শোক কাহিল করে ফেলে ফেরদৌসী বেগমকে। জগৎ যেন ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করেছে। বড় ছেলে এর মধ্যেই মানসিক জোরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়ে মায়ের মনে সাহসের যোগান দেয় কিছুটা। কিন্তু এ সাহস তো আর স্বামী-সন্তানকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। নিষ্ফল ভাবনার জলে ডুবতে থাকেন তিনি। স্বামী-সন্তান হারানোর বেদনা আর সঙ্গে যুক্ত হলো অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা। এ দু'য়ের যোগসূত্রে তৈরি হওয়া বিষণ্নতা গ্রাস করতে থাকে তাকে। এ সময় বাসায় ছাত্র পড়িয়ে কোনো রকমে সংসার চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। বেঁচে থাকার একমাত্র ভরসা যেন বড় ছেলেটার সুন্দর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা।

এমন সময় দাদা শ্বশুর হাজি মোঃ সাত্তার মাস্টার তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রেরণা দেন তিনি। বাল্যকাল থেকে সুপ্তাবস্থায় থাকা সমাজসেবার বাসনা এবং বিষণ্নতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা কাটিয়ে ওঠার উপায়

হিসেবে তিনি ইউপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বর্তমান মেয়াদের আগের মেয়াদে সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচনে অংশ নিয়ে তিনি ইউপি সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হওয়ার পর দক্ষতার বিবেচনায় তিনি ইউনিয়ন পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। সেখানে তিনি দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে জনসেবা করতে থাকেন। পরিষদের কাজে দক্ষতার পুরস্কার হিসাবে তিনি থানা সমন্বয় কমিটির সদস্যও মনোনীত হন। পরিষদের সদস্য হিসেবে বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রচারণাধর্মী বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করে সফল হন। প্রত্যন্ত অঞ্চলের সামাজিক কূপমণ্ডূকতা মোকাবিলার কৌশল হিসেবে তিনি ধর্মীয় মূল্যবোধকে কাজে লাগিয়ে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করেন। সমাজের জন্য ভাল কাজের প্রতি গ্রামীণ নারীদের উৎসাহ দিতে থাকেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করতেন, নারী ও পুরুষের যৌথ কাজ গড়ে না উঠলে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। এজন্য পিছিয়ে পড়া অবহেলিত নারীদের কর্মসংস্থান অতীব জরুরি বলে তিনি মনে করতেন। কিন্তু তখনো তিনি এ পথের সন্ধান পান নি।

২০০২ সালে হাইমচর থানার নির্বাহী কর্মকর্তার (টিএনও) অফিস থেকে একটি চিঠি আসে তার কাছে। চিঠিতে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। হাইমচর কলেজের প্রিন্সিপাল এবং বড় ছেলে রনি তাকে প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহ যোগায়। হাইমচর কলেজে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ' পরিচালিত ৪২৫তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন ফেরদৌসী বেগম। প্রশিক্ষণে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সকলেই অংশগ্রহণ করেন। চারদিনের এই প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তিনি জানালেন, "যেন অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর জগতে এলাম। প্রশিক্ষণের পর নিজেকে অনেক সাহসী মনে হলো। মনে হলো আমাদের কাজ অন্যেরা করে দেবে কেন? নিজেরাই সব কিছু করার সামর্থ্য রাখি।" প্রশিক্ষণের স্মৃতি উচ্চারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, "নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে বলছিলেন জমির ভাই। এই কথাগুলো আমি কোনো দিন ভুলবো না।"

সংগঠিতভাবে সামনে এগিয়ে চলা

নির্বাচন পরবর্তী কর্মকাণ্ড এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের সুবাদে ইতোমধ্যে তিনি এলাকায় বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এ অবস্থায় তিনি সুপরিকল্পিতভাবে স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম গড়ে তোলেন। এরপর সংগঠিত উপায়ে তিনি নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনি মনে করেন, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ করতে গেলে হটকারী একরোখা পদক্ষেপ নিলে হবে না; কৌশলও নির্ধারণ করতে হবে।

শিশু ধর্ষণের বিচার

পার্শ্ববর্তী গ্রাম কমলাপুরে শিশু ধর্ষণের একটি খবর কানে আসে ফেরদৌসী বেগমের। এ খবর শুনে এলাকায় তিনি প্রতিবাদ সভা আহ্বান করেন। এতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় স্থানীয় মুরুব্বী গোছের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এ সময় তিনি কৌশল অবলম্বন করে প্রতিবাদ সভা স্থগিত করে মুরুব্বীদের কথামতো শালিসের আয়োজন করেন। সালিশে নিজে উপস্থিত থেকে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুর ক্ষতিপূরণ বাবদ ৪০,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

বাল্যবিবাহ রোধ

আলাপের প্রসঙ্গ ধরে ফেরদৌসী বেগম বলেন, "আমাদের সমাজে বাল্যবিবাহের মূল কারণ দারিদ্র্য আর সামাজিক মূল্যবোধ। ফলে বাল্যবিবাহ রোধ করতে গেলে এ দু'টো বিষয়কে মাথায় রাখতে হবে।" হটকারী সিদ্ধান্ত নেয়ার চেয়ে এক্ষেত্রে কৌশলী হতে হবে। একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, কমলাপুর গ্রামে ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১১ বছর বয়সী এক শিশুর বিয়ের আয়োজন করে তার বাবা। এ খবর জানতে পেরে ফেরদৌসী ছুটে যান সেখানে। প্রথমে বিয়েতে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু কোনোভাবেই তার বাবাকে বিয়ে ভাঙার জন্য রাজি করাতে পারছিলেন না। অবশেষে কন্যাশিশুটির বাবার সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয়। অতঃপর বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে শিশুটির বাবাকে বিয়ে ভাঙ্গাতে রাজি করান তিনি।

উপরিউক্ত ধরনের কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি ফেরদৌসী বেগম, পরিবেশ রক্ষামূলক কাজের সঙ্গেও নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। ২০০৩ সালে উজ্জীবকবৃন্দ, ব্র্যাক কর্মী, পুষ্টি কর্মী এবং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের সমন্বয়ে উত্তর আলগী ইউনিয়নকে ১০০ ভাগ স্যানিটেশনের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তিনি। তিনি জানান, ২০০৩ সাল থেকে পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে এ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কাজ শুরু করেন এবং তা সফলও হয়েছে। এছাড়া তিনি নিজে বৃক্ষরোপণের কাজ করে গ্রামবাসীকে উৎসাহিত করেছেন। এসব কাজের পাশাপাশি গ্রামীণ নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য তিনি চেয়ারম্যানের সহায়তা নিয়ে ইউনিয়নের ৪০ জন নারী উজ্জীবককে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করান। প্রশিক্ষণ গ্রহীতারা ২/১ জন বাদ দিয়ে প্রায় সবাই এখন স্বাবলম্বী। এ ধরনের কাজ করে তিনি বসে থাকার মানুষ নন। সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক নানান কর্মসূচিও পালন করে চলেছেন। এনজিও কর্মী, উজ্জীবক, স্থানীয় যুবক ও গৃহিণীদের নিয়ে গ্রামবাসীকে এইচআইভি/এইডস বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে তিনি কর্মশালার আয়োজন করেন তিনি। এছাড়া ২০০৩ সাল থেকে ইউনিয়নে মা ও শিশুস্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, তালাক, ধর্ষণ, নারী ও শিশু পাচার রোধের ওপর গুরুত্বারোপ করে ক্যাম্পেইন ও উঠান বৈঠকের আয়োজন করে থাকেন। এসব কাজের ফাঁকে ফাঁকে আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানি বিষয়ে কর্মশালা ও উঠান বৈঠকের আয়োজন করেন। আর এসব কাজকে অর্থবহ করে তুলতে স্থানীয় উজ্জীবক ও সাধারণ মানুষদের সম্পৃক্ত করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্মরণীয় দিবসগুলো যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে থাকেন। নারী নেত্রী ফেরদৌসী বেগম 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ' পরিচালিত উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কাজ করার মধ্য দিয়ে নারীকে যে সমাজ অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে দেখে; সেখানে তিনি এক পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর উজ্জীবক ফোরাম গঠন করে ফোরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে তিনি 'হাইমচর বার্তা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন। হাইমচর কলেজের প্রিন্সিপালের সম্পাদনায় পত্রিকাটি মাসিক থেকে এখন পাক্ষিক হয়েছে।

ফেরদৌসী বেগম তার নিজ কর্মগুণে সমাজের বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে এগুলোকে সঠিক পথে পরিচালিত করার দিক নির্দেশনা প্রদান করে চলেছেন। বর্তমানে তিনি কমলাপুর মাতৃকেন্দ্রের সভাপতি, হাইমচর থানা ক্রীড়া কমিটি এবং হাইমচর কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

ফেরদৌসী বেগম হতাশা-বিষণ্নতাকে পরাস্ত করে সমাজ বদলের আকাঙ্ক্ষায় যেভাবে কাজ করে চলেছেন তা আমাদের সামনে চলার পথকে প্রসস্ব করে, আমাদের স্বপ্ন দেখতে শেখায়। এভাবে গ্রাম বাংলার প্রতিটি প্রান্তে এক জন করে ফেরদৌসী বেগম এগিয়ে এলে আমাদের কল্পনার সুদিন বাস্তবে আসতে হয়ত আর বেশি দেরি হবে না।

হেনা বেগমঃ ঘুরে দাঁড়ানো এক নারী

আবুল বাশার

মোসাম্মৎ হেনা বেগম। আব্দুল খালেক ও হোসনা বেগমের সংসারে প্রথম সন্তান হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন ১৯৭৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি। বাবা আব্দুল খালেক শ্রীমঙ্গলে চা বাগানে চাকরি করতেন। চা বাগানে আচ্ছাদিত শ্রীমঙ্গলের গাঢ় সবুজের সঙ্গে হেসে খেলে শৈশব কেটেছে হেনা বেগমের। শ্রীমঙ্গল রেল স্টেশনের কাছে চিন্তামণি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু তার। হেনা বেগমের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হওয়ার পর বাবা আব্দুল খালেক চা বাগানের চাকরি ছেড়ে সিলেট চলে এসেছিলেন। হেনা বেগম স্মৃতি হাতড়ে জানালেন, "আমার মামা বিদেশ থাকতেন। তিনি আমার বাবাকে বাড়ি করার জন্য কিছুটা জায়গা দিয়েছিলেন। আর ব্যবসা করার জন্য কিছু টাকাও দিয়েছিলেন। বাবা চা পাতার ব্যবসা শুরু করেছিলেন।"

হেনা বেগম ততদিনে সিলেট হাউজিং এস্টেট গার্লস স্কুলের ছাত্রী। ইতোমধ্যে বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। হেনা বেগম জানালেন, "খুব কষ্ট করে লেখাপড়া করছিলাম।" তখন ১৯৮৮ সাল। ৭ম শ্রেণির ছাত্রী হেনা বেগম। এমন সময় তার বিয়ের প্রস্তাব আসে। পাত্র মোহাম্মদ হোসেন। কাপড় ও কসমেটিকসের ব্যবসা করতেন। গ্রামের বাড়ি শরিয়তপুর। মোহাম্মদ হোসেনের বোন হেনা বেগমকে দেখে পছন্দ করে ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেন। বাবা অসুস্থ থাকায় হেনা বেগমদের পরিবারে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ভর করেছে। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা থেকে মেয়েকে মুক্তি দিয়েছিলেন বাবা। মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ১৯৮৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ হোসেনের হাতে তুলে দেন বাবা আব্দুল খালেক। চৌদ্দ বছরের নাবালিকা হেনা বেগম বাবার দরিদ্র সংসার হালকা করতে নিজের কাঁধে বিয়ের বোঝা তুলে নিয়ে শ্বশুর বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

বিয়ের পর লেখাপড়া করার জন্য কিছুদিন বাবার বাড়িতেই ছিলেন হেনা বেগম। কিন্তু অল্প কিছু দিন গড়াতেই স্বামী ব্যবসার কাজে ঢাকায় পাড়ি জমান। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্বামীর ইচ্ছা যে স্ত্রীর ইচ্ছা! সংসারের ঘানি টানা যেন তার কাজ। তাই স্বামীর সঙ্গে তাকেও ঢাকা আসতে হলো।

ঢাকায় নিয়ে আসার সময় লেখাপড়া করানো হবে বলে স্বামী-শ্বশুর কথা দিয়েছিলেন তাকে। কিন্তু সে 'কথা' যেন কথার কথা। স্বামী, স্বামীর এক ভাই, এক বোন আর শ্বশুর-শাশুড়ি সব যেন দেবতাসনের হুকুমদাতা। শ্বশুর বাড়ির কাজ সম্পাদনের জন্য নারীকে বোধ হয় বধূ হয়ে স্বামীর ঘরে যেতে হয়। লেখাপড়া তো আর কাজ নয়।

পিতার বাড়ির অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি নিয়ে হেনা বেগম লেখাপড়ার অনিশ্চয়তাকে বরণ করলেন। হেনা বেগমের হতাশ মনে আশার আলো সঞ্চার ঘটালেন চাচাশ্বশুর খলিলুর রহমান। খলিলুর রহমান ছিলেন ঢাকা জজ কোর্টের পাশে আজিজিয়া ইসলামিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তার দু'মেয়ে। তিনি মেয়ে দু'টোর সাথে হেনা বেগমকে স্কুলে যেতে উৎসাহ দিলেন। মাঝখানে বিরতির পর চাচা শ্বশুরের উৎসাহ ও প্রেরণায় হেনা বেগম আজিজিয়া ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ছাত্রী হলেন হেনা বেগম। কিন্তু নিয়মিত স্কুলে যাবার সুযোগ পেতেন না। স্বামী ব্যবসার কাজে মাঝে মধ্যে ভারত যেতেন। সেই সময়টাতে হেনা বেগম স্কুলে যেতেন।

হেনা বেগম এর মধ্যে দু'সন্তানের জননী হয়েছেন। ১৯৮৯ সালের ৩১ মে বড় ছেলে হুমায়ূন কবির রনি জন্মগ্রহণ করেন। আর ১৯৯২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন মেয়ে হাসনা আরবী ছোঁয়া। শ্বশুর-শাশুড়ির চক্ষুশূল হয়েও সন্তান লালন পালনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল আগ্রহ আর মানসিক শক্তি নিয়ে ১৯৯৪ সালে হেনা বেগম এসএসসি পাশ করেন।

হেনা বেগম বললেন, "আমার লেখাপড়া ওখানেই শেষ।" ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ের পর স্বামীর সংসারে নানান ধরনের অন্যায় আচরণের কারণে মনের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করতো। কিন্তু কখনো কোন প্রতিবাদ করতে পারতেন না। বাব-মাকেও বলতে পারতেন না। বলা তো দূরের কথা, বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতও হতো না।

আত্মকর্মসংস্থানের স্ব-উদ্যোগ

স্বামীর সংসারে নারীর এরূপ অবস্থানের জন্য হেনা বেগম পরনির্ভরতাকে কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাই আত্মকর্মসংস্থানের জন্য তিনি

১৯৯৪ সালে এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার পর স্বামীকে বুঝিয়ে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ তৈরি করেছিলেন। স্বামীর সম্মতি নিয়ে হেনা বেগম ওয়ারি কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিন মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষ করে মাটির ব্যাংকে জমানো ২৭৫০ টাকা দিয়ে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন তিনি। হেনা বেগম জানান, এই মেশিনটি কেনার জন্যও কেউ তাকে সাহায্য করে নি। নিজে গুলিস্থান থেকে একটি বাটারফ্লাই কোম্পানির সেলাই মেশিন কিনেছিলেন।

এরপর সেলাই মেশিনে কাজ শুরু করেন তিনি। প্রতিদিন দুই থেকে আড়াইশো টাকার কাজ করতেন। এছাড়া মজুরি নিয়ে কাঁথা সেলাই করতেন। কাজের মান ভাল হওয়ায় আশপাশে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। মোটামুটি এ সময়টায় তার উপার্জন ভাল হচ্ছিল। উপার্জনের টাকা দিয়ে 'স্বামীর সংসারে' সুখ আনার চেষ্টা করেন তিনি। উপার্জনের অর্থ দিয়ে সংসার স্বাবলম্বী করার পর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার যাতনা লাঘব করার জন্য তিনি আশপাশের দরিদ্র্য শিশুদের পড়ানোর একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ঢাকা জজ কোর্টের পেছনে ৮৮, গোয়ালনগর লেনের যে বাসায় তিনি স্বামীর সংসারে বসবাস করতেন, সেখানেই প্রায় ১৫/২০ জন দরিদ্র্য শিশুকে পড়ানোর ব্যবস্থা করেন হেনা বেগম। মাঝে মাঝে তাদের চক-পেন্সিলসহ শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণও কিনে দিতেন তিনি। কিন্তু রক্ষণশীল পরিবার সেটাকে ভালোভাবে মেনে নিতে পারল না। উপার্জিত পুরো টাকা সংসারে জমা না দিয়ে আশপাশের বাচ্চাদের লেখাপড়ার পিছনে ব্যয় করায় শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্বামীর কাছে আরও বিরাগভাজন হয়ে উঠলেন তিনি। শাশুড়ি-ননদ তার এ উদ্যোগকে কোনভাবেই সহ্য করতে পারেন নি। শুরু হলো আরো অত্যাচার ও নির্যাতন। স্বামীও যোগ দিলেন মা ও বোনের সঙ্গে। নারীর কর্মসংস্থানকে পুরুষতন্ত্র মনে হয় এভাবেই ভয় পায়। স্বামী মোহাম্মদ হোসেন তার এ

উদ্যোগ বন্ধ করার জন্য কু-নজর দিলেন তার কর্মসংস্থানের উপর। ফতোয়া দেয়ার মত ঘোষণা দিলেন, কোন কাজের জন্য বাইরে যাওয়া যাবে না। কোন কাজে বাইরে গেলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যাবে।

স্বামীর অবরোধের কারণে বাধ্য হয়েই হেনা বেগম দূর মহল্লার কাজ বন্ধ করলেন। তার আয়ও কমে আসল। কিন্তু তাতে কি। স্বামী যখন বাড়ির বাইরে চলে যেত তখন তিনি বাচ্চাদের ডেকে এনে পড়াতেন। এতে শাশুড়ি তার উপর যে কাজ চাপাতো তা ওই বাচ্চাদের মায়েরা এসে করে দিয়ে যেতেন। এছাড়া, মায়েরা মাঝে মাঝে বাচ্চাদের পড়ানোর বিনিময়ে হেনা বেগমকে কিছু নগদ অর্থও প্রদান করতেন। কিন্তু লুকিয়ে আর কত চলা যায়। বাচ্চারা পড়তে আসে এ ব্যাপারটা স্বামী দেখে ফেলে। শুরু হয় অত্যাচার। এ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য হেনা বেগম চাচা শ্বশুরকে বিচার দেন। চাচা শ্বশুর ভাইপোকে বকা দেয়ায় চাচা-ভাতিজার সম্পর্কে অবনতি ঘটে। এর পুরো দায় এসে চাপে হেনা বেগমের ওপর।

স্বামীর ঘরে নির্বাসিত হেনা বেগম ১৯৯৬ সালের শেষ দিকে জানতে পারেন মোহাম্মদ হোসেন আরেকজনকে বিয়ে করেছেন। শত চেষ্টা করেও একে তো স্বামীর মন পেলেন না। তার উপর সতীনের আগমন বার্তা। না পারছেন সইতে, না পারছেন কইতে। তিনি আরো জানতে পারেন, ননদ ও শাশুড়ির সম্মতিতেই স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। শাশুড়ি-ননদ বলতেন বউ যেখানে শুধু বাইরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, সেখানে ছেলের দ্বিতীয় বিয়ে করা উচিত। এসময় স্বামী দ্বিতীয় বিয়ের কথা অস্বীকার করে হেনা বেগমকে বাপের বাড়ি থেকে ৫০ হাজার টাকা এনে দেবার জন্য চাপ দিতে থাকেন।

হেনা বেগম ও তার স্বামী যে ঘরটিতে বসবাস করতেন তা ছিল হেনা বেগমের নামে। প্রায় রাতে স্ট্যাম্প নিয়ে এসে মোহাম্মদ হোসেন ঘরটি তার নামে লিখে নেয়ার জন্য হেনা বেগমকে স্বাক্ষর করতে বলতেন। তখন হেনা বেগমের সন্দেহ হতো; রাতের বেলায় ফাঁকা স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে মোহাম্মদ হোসেন দ্বিতীয় বিয়ের বৈধতা তৈরি করতে চায়। এসব ভয়াবহ ষড়যন্ত্র পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় নিরুপায় হয়ে হেনা বেগম একবার আত্মহত্যার মতো নির্মম সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সন্তানদের

কথা চিন্তা করে সে পথে আর পা বাড়ান নি। স্বামীর চাপে ৫০ হাজার টাকা জোগাড় করে দিয়েছিলেন হেনা বেগম। কিন্তু তাতেও চাওয়ার পালা শেষ হয় নি স্বামীর। এরপর হাতের পাঁচ সেলাই মেশিনটা বিক্রি করে টাকা দেয়ার জন্য চাপ দিতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিয়ের ঘটনাটি যখন জানাজানি হয়ে গেল, তখন দ্বিতীয় স্ত্রীকে ঘরে আনার তোড়জোড় শুরু করেন মোহাম্মদ হোসেন।

কোন কূল কিনারা না করতে পেরে হেনা বেগম একদিন মেয়ে ছোঁয়াকে সঙ্গে নিয়ে সেলাই মেশিন বিক্রি করতে বের হলেন। সেলাই মেশিন বিক্রি করতে বের হয়ে প্রতিবেশী শিউলিদের বাড়িতে গেলেন। হেনার পরিবারের পরিস্থিতি আগে থেকেই কিছুটা জানতেন শিউলির মা। সর্বশেষ পরিস্থিতি শোনার পর শিউলির মা হেনা বেগমকে বললেন, "এভাবে তুই হয়তো আর বেশি দিন থাকতে পারবি না, বরং তুই এ সংসার ছেড়ে চলে যা।"

সেটিই ছিল হেনা বেগমের বিদায়। প্রতিবেশীদের বাড়িতে সাতদিন লুকিয়ে থেকে ৭শ টাকার কাজ করে সিলেট যাওয়ার রাস্তা খরচ যোগাড় করেছিলেন হেনা বেগম। প্রতিবেশীর বাড়িতে থাকা অবস্থায় হেনা জানতে পারেন যে, তার স্বামী-শ্বশুর বলে বেড়াচ্ছেন, বউ টাকা চুরি করে ঘর থেকে পালিয়েছে। ঢাকা থেকে সিলেট বাপের বাড়িতে ফিরে এলেন হেনা বেগম। দিন তারিখ ঠিক মনে নেই। ১৯৯৭ সালে রমজান মাসের শেষ দিকে তিনি সিলেটে ফিরে আসেন। বাপের বাড়িতে এসে দেখেন সংসারের অবস্থা করুণ। ভাই-বোনগুলো ছোট ছোট। স্বামীর ঘর ত্যাগ করে আসায় মা বললেন, "চলে আসা ঠিক হয় নি। কষ্ট করে থাকতে পারতি।"

উপায়ন্তর না দেখে হেনা সিলেট শহরে একটি টেইলারিং কারখানায় কাজ যোগাড় করেন। সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসতেন। দৈনিক ৬০ টাকা রোজগার করতেন। এভাবে এক মাস কাজ করার পর স্বামী ঢাকা থেকে এসে মেয়ে ছোঁয়াকে নিয়ে যান। এখন সঙ্গী কেবল দারিদ্র্য মোকাবেলার জন্য হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম।

দুশ্চিন্তা থেকে দূরে থাকার জন্য কারখানার কাজ শেষ করে বাসায় ফেরার পর বাড়িতেও কাজ করা শুরু করেন হেনা। এভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গড়ে দৈনিক ২০০ টাকা আয় করতেন তিনি। এ সময়টাতে মানবাধিকার সংস্থার সমঝোতায় মেয়েটাকে ফেরত পেলেন। কিন্তু তালাক হলো না।

বিবাহিতা মেয়ে বাবার বাড়িতে থাকলে সমাজ ও পরিবার উভয়ই মনে করে বোঝা। এ ভুল ধারণাটি ভাঙ্গার জন্য এবং বাবার সংসারের করুণ দশা লাঘব করার প্রবল প্রত্যয়ে তিনি প্রতিটি সময় কাজে লাগাতে থাকলেন। টেইলারিং কারখানার কাজ করে বাসায় ফিরে আবার সেলাইয়ের কাজ করতেন। এর ফাঁকে তিনি বিউটি পার্লারের কাজও শিখে ফেলেন। ছুটির দিন শুক্রবারে বিয়ের কনে সাজিয়ে এক থেকে দেড় হাজার টাকা পেতেন। এভাবে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করে হেনা বেগম ৩ বোনের বিয়ে দেন। এছাড়া ভাইকে ইতালি পাঠানোর জন্য ১ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন।

হেনা বেগম জানালেন, "এতসব কাজের ফাঁকে একটি ব্যবসা গড়ে তোলার চেষ্টা চালালাম।" ২০০০ সালের দিকে সিলেট শহরের মীর্জা ডাঙ্গালে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে 'হাসনা হেনা লন্ড্রি এ্যান্ড টেইলার্স' নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। এখানে সব মিলিয়ে ১ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন। প্রায় কাছাকাছি সময়ে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে নাজিরগাঁও এলাকায় ৫০ হাজার টাকা দিয়ে ৬ শতক জমিও ক্রয় করেছিলেন। ২০০৩ সালের দিকে ভাই বিদেশ চলে যাবার কারণে দেখাশোনা করার লোকের অভাবে মীর্জা ডাঙ্গালের দোকানটি গুটিয়ে নেন এবং বাড়িতে পোশাক বিক্রি শুরু করেন।

এরকম সময় 'সিলেটের ডাক' পত্রিকায় উজ্জীবক প্রশিক্ষণের একটি খবর দেখতে পান হেনা বেগম। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশে'র পরিচালনায় ৭১৫তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ১০০ টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করেন তিনি। সিলেট প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত মহিলাদের জন্য সেই বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন হেনা বেগম। প্রশিক্ষণ সম্পর্কে হেনা বেগম জানালেন, "আগে এ প্রশিক্ষণটি নিতে পারলে আমার কাজগুলো আরো ভালো ভাবে করতে পারতাম। তারপরও মনে হলো, এতদিন

নিজের জন্য করেছি। এখন থেকে আমার মত অন্য মানুষদের জন্য কাজ করতে হবে। বোনদের বিয়ে দিয়ে, ভাইটাকে বিদেশ পাঠিয়ে মনে হয়েছিল আমার দায়িত্ব শেষ। কিন্তু না, অনেক কাজ বাকি আছে। আমাকে আরো কাজ করতে হবে।"

উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর থেকে হেনা বেগম আরো দক্ষতার সঙ্গে পেশাগত কাজের পাশাপাশি সমাজ সেবামূলক কাজ শুরু করেন। উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরপরই ব্র্যাক পরিচালিত যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। ওই সময় তিনি ১ থেকে ১০ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত ওই কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এরপর জাতীয় মহিলা উন্নয়ন সংস্থা থেকে মোমবাতি ও সাবান তৈরির উপর ৩ মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরের ব্যাচে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর হেনা বেগম বিভিন্ন উৎসবে বিশেষ করে মেলা-পার্বণে তার প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যপণ্য নিয়ে দোকান দেন। এসব কাজের পাশাপাশি তিনি বাড়িতেই একটি শো'রুম দিয়েছেন। সেখানে পাটের জুতা, শিকা প্রভৃতি বিক্রি করেন। এছাড়া মেলাতেও তিনি সেগুলো দিয়ে স্টল সাজান। বিসিকে'র পরামর্শে হেনা বেগম এখন তার এ উদ্যোগকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন। এখন এটির নাম 'ছোঁয়া আত্মকর্মসংস্থান'।

হেনা বেগম অক্লান্ত পরিশ্রম করে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাকে জয় করেই বসে থাকার মানুষ নন। উজ্জীবক প্রশিক্ষণ তাকে শিখিয়েছে সমাজ পরিবর্তনে অংশ নিতে। সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখার জন্য হেনা বেগম ১১তম ব্যাচে স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষককের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়া নারী জাগরণকে অগ্রসর করতে এখন তিনি নারী নেত্রী হিসেবে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। বাল্যবিবাহ রোধ, নারী নির্যাতন রোধকল্পে হেনা বেগম প্রচারধর্মী নানান কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকেন। এসব কাজকে তাৎপর্যপূর্ণ করতে তিনি নিয়মিতভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস, কন্যাশিশু দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেন। এ পর্যায়ে বলা যায়, হেনা বেগম একজন স্বাবলম্বী পরিপূর্ণ মানুষ। নারী জন্মগতভাবে পরনির্ভরশীল এ ধারণা তিনি ভেঙ্গে দিয়ে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

নতুন আলোয় নতুন করে জেগে ওঠা এক মানুষ

সিদ্দিক রুবেল

তিতাস বিধৌত ব্রাহ্মণবাড়িয়া অতি প্রাচীন কাল থেকে শত শত শিল্পীর দীপ্ত পদচারণায় মুখরিত। সঙ্গীতের সুর মূর্ছনা আর লেখকের লেখনীর মধ্য দিয়ে এ এলাকার মানুষের জীবন সংগ্রামের যে কাহিনী রচিত হয়েছে, তা সমৃদ্ধ করেছে সমগ্র বাংলার শিল্প সম্ভারকে। কিন্তু যে সংগ্রাম আর যন্ত্রণায় পরিশীলিত হয়ে নিজের ভেতরের শিল্পী সত্ত্বাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন শিল্পীরা, সে কাহিনী উপেক্ষিত থেকেছে বরাবরই। এমনই একজন মানুষ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সঙ্গীত শিল্পী রুনাক সুলতানা পারভীন। সুর সম্রাট দি আলাউদ্দীন সঙ্গীতাঙ্গনের সঙ্গীত শিক্ষক এবং বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের নিয়মিত সঙ্গীত শিল্পী। সুরেলা কণ্ঠ আর মানুষের প্রতি ভালবাসা দিয়েই জয় করেছেন তিনি সকলের হৃদয়। কিন্তু সহজ সরল উচ্ছলতার হাসিমাখা সুন্দর মুখখানার আড়ালে বিষাদের যে দীর্ঘ কালো ছায়া লুক্কায়িত তার খবর অনেকেরই অজানা। ৩৩ বছর বয়সের জীবনে যে কষ্ট আর যন্ত্রণার পথ তিনি পাড়ি দিয়েছেন সে পথে হারিয়ে গেছে এদেশের বহু নারীর জীবন। সেখান থেকে বাঁচার সংগ্রাম আর একজন নারীর পরিচয় নিয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচার চেষ্টা তাকে পৌঁছে দিয়েছে এক অনন্য ব্যতিক্রম পথে।

আমাদের এই তথাকথিত সমাজে জন্মগ্রহণ করে পারভীন মুখোমুখি হয়েছিলেন এক নিষ্ঠুর বাস্তবতার। সেখানে পিতা ছিলেন দূরের মানুষ। ব্যস্ত থাকতেন তার দ্বিতীয় পক্ষের সংসার নিয়ে। ফলে ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত নানার বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করেছেন। অসুস্থতার কারণে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী যখন পিতাকে পরিত্যাগ করে তখন তাকে শহরের বাড়িতে নিয়ে যান। একদিন সকালে গুণগুণিয়ে গান গাইতে শুনে বাবা তাকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন সুর সম্রাট দি আলাউদ্দীন সঙ্গীতাঙ্গনে। অতি দ্রুতই গানের মৌলিক বিষয়গুলো আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন তিনি। সঙ্গীতাঙ্গনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অনেক পুরষ্কারও জিতেছিলেন। কিন্তু মাত্র ২ বছর পরেই আবার এলোমেলো হয়ে যায় সব কিছু। ১৬ বছর বয়সের সেই মেয়েকে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দেয়া হয়। পাত্রের বয়স ৫০ বছর। বিয়ের মাত্র ৩ মাসের মধ্যেই অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী'কে রেখে চলে যায় তার স্বামী। সে বয়সেই সন্তানের লালন পালনের ভার এসে পড়ে তার উপর। ফলে ভাটা পড়ে গানের চর্চায়। বিদেশে থাকা অবস্থায় স্ত্রী-পুত্রের নিয়মিত খোঁজখবর করেন নি তিনি। এভাবেই কেটে যায় দীর্ঘ ১০টি বছর। পিতার মৃত্যুর সময় একমাত্র পৈত্রিক বাড়িটি ছাড়া অন্য কোন সম্পদ তার ভাগ্যে জোটে নি। পিতার মানসিক ভারসাম্যহীনতার সুযোগে জবর-দখল হয়ে যায় অনেক কিছু। পিতার মৃত্যুর পর সংসারের সকল দায়-দায়িত্ব এসে চাপে পারভীনের কাঁধে।

সে সময় প্রচলিত সমাজের আর পাঁচজন নারীর মত আরেকজন পুরুষের কাঁধে তার সকল দায়িত্ব সমর্পণ করেন নি। নিজের শক্তি সাহস নিয়ে ওঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন নানা ভাবে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকার মাঝামাঝিতে অবস্থিত বাড়িটির কারণেও তার উপর চাপ এসেছে অনেক। অনেক পুরুষই তখন সম্পদের লোভে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সামনে এসেছিলেন। চলাফেরার প্রতিবন্ধকতাসহ জীবন নাশের হুমকিতেও পিছু হটেন নি পারভীন। নিজের সব কিছুকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় প্রাণপণ লড়াই করেছেন তিনি। সেসময় তার প্রতি অকৃত্রিম বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন দুইজন মানুষ। একজন তাসলিমা সুলতানা নিশাত এবং অন্যজন কবি আব্দুল মান্নান সরকার। তাদের সহযোগিতায় সুর সম্রাট দি আলাউদ্দীন সঙ্গীতাঙ্গনের সঙ্গীত প্রশিক্ষককের দায়িত্ব পান তিনি। আর গানের টিউশনি করে চালিয়েছেন সংসারের খরচ। একা একা এভাবে পথ চলাকে মেনে নেবে কেন এ পুরুষ শাসিত সমাজ। বিভিন্নভাবে পারভীন সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্যগুলোকে উচ্চারিত হতে দেখেছেন তিনি। অনেকেই এই ভদ্র সমাজে তার অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। এমনকি তার বাড়িতে সহকর্মী ও বন্ধুদের আসা যাওয়া নিয়ে কুৎসিত মন্তব্য শুনতে হয়েছে তাকে।

অনেকেই সহমর্মী হয়ে সমাজে তার অবস্থানকে ন্যায়সঙ্গত করার প্রয়োজনে আরও একবার বিয়ের প্রস্তাব হাজির করেছেন। কিন্তু সন্তানের জন্য সুন্দর একটি ভবিষ্যত নিশ্চিত করাকে নিজের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছেন তিনি। সব কিছুকে এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করেছেন সব সময়। কিন্তু সেই প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতাতে দমবার পাত্র তিনি নন।

আর এই হিংস্রতার ছোবল থেকে তাকে রক্ষার জন্যই যেন তাসলিমা সুলতানা নিশাত ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির বিপক্ষে। অনুপ্রাণিত করেছেন আশপাশের মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের আশা দিয়ে। পারভীনকে তিনি এভাবেই বুঝিয়েছিলেন নিজের সম্পর্কে, অবস্থান আর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের জন্য নিজেরও যে অনেক দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব বুঝলে এবং পালন করতে পারলে যে মানুষগুলো আজ তার সমালোচনা করছে তা পাল্টানো সম্ভব। এই উপলব্ধির পূর্ণতা দিতে পারভীনকে আহ্বান জানান ২০০২ সালে সুর সম্রাট দি আলাউদ্দীন সঙ্গীতাঙ্গনে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ পরিচালিত চারদিনের উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে। নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে জানা ছিল এই প্রশিক্ষণের অন্যতম বিশেষ একটি দিক। সেখানে তিনি জানতে পারেন তার মতই আরও হাজার হাজার নারী প্রতিমুহূর্তে নির্যাতিত হচ্ছে এ দেশে। শুধু নারী বলে পিছিয়ে আছে এমন নয়। পিছিয়ে আছে শিক্ষায়, কাজে, মর্যাদায় এমনকি নিজের পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে।

প্রশিক্ষণ থেকে তিনি বুঝতে পারেন, একজন বা দুইজন নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিয়ে শুধু এই বৈষম্য দূর করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সকলের অধিকার সচেতন হয়ে ওঠা। সেই অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করা। শুরু হলো কাজ, তাসলিমা সুলতানা নিশাত ও পারভীন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ঘুরে নারীদেরকে তাদের অবস্থান সম্পর্কে বুঝিয়েছেন আর অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য করেছেন শতাধিক কর্মশালা। নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা, যৌতুক ও বাল্যবিবাহের কুফল, নারীর উপর সহিংসতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নিয়মিতভাবে আলোচনা সভা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করেছেন। এভাবেই ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে পারভীনের পরিচয়। শুধু নারী নয়, সমাজের পিছিয়ে পড়া, অধিকার বঞ্চিত নারী সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিতি পেতে থাকেন। নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার প্রভাব পারভীনের সব কাজেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। যাকে একসময় আঞ্চলিক গানের শিল্পী হিসাবে জানত সবাই, তিনি এখন ধ্রুপদী সঙ্গীতেও আস্তে আস্তে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে থাকেন। বাড়তে থাকে নিজের আত্মবিশ্বাস। সে বিশ্বাসের ভিত্তিকে আরও মজবুত করতেই ২০০৪ সালের ৯ম স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন তিনি। ফিরে এসে নিজের গ্রামের বাড়ি সরাইলে ২টি ব্যাচের উজ্জীবক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। এলাকার পিছিয়ে পড়া, সুবিধা বঞ্চিত নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ৩০ জন নারীকে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশে'র সহায়তায় দিয়েছেন সেলাই প্রশিক্ষণ।

পারভীন ২০০৪ সালে বাংলাদেশ বেতার শিল্পী হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন জানান। প্রাথমিক ও চূড়ান্ত বাছাইয়ের পর বাংলাদেশ বেতারের শিল্পী হিসেবে নির্বাচিত হন তিনি। সে দিনের সেই আনন্দঘন মুহূর্তটাকে স্মরণ করতে গিয়ে এখনও তার চোখে আনন্দের অশ্রু ঝরে পড়ে। অশ্রুশিক্ত নয়নে তিনি বলছিলেন, "দুঃখ কষ্টের এই জীবনে এক ফোঁটা আনন্দের মূল্য তিনি বোঝেন।" তাই নিজেকে এগিয়ে নেবার যে চেষ্টা তিনি শুরু করেছেন তা অব্যাহত রাখতে চান সামর্থ্যের শেষ বিন্দু টিকে থাকা পর্যন্ত। সেই ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ টেলিভিশনের শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্তির আবেদন জানান। এখানেও সফল হয়েছেন তিনি। ডিসেম্বর মাসেই তালিকাভুক্তির চিঠি পেয়েছেন।

আর এসব কিছুর মধ্য দিয়ে নিজের একমাত্র সন্তানটিকে সুশিক্ষিত এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চান। ২০০৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিতে যাচ্ছে তার সন্তান। কিন্তু নারী কিংবা দুর্বলের প্রতি লাঞ্ছনা বা নির্যাতিতের ইতিহাস এক দিনের নয়। সেই সুদূর অতীতে যার শুরু একদিনের চেষ্টায় তা সফল হবে কেমন করে। পারভীনের সেই যন্ত্রণার অবসান এখনও হয় নি। এখনও শহরের প্রভাশালীদের একমাত্র চেষ্টা পারভীনের বাড়িটি দখল করা। বাড়ির কিছু অংশের জমি দখল করে রাস্তার উপর মার্কেট, বহুতল ভবন নির্মাণ করেছেন তারা। পারভীন এদের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গতভাবে লড়ে চলেছেন। বহু চেষ্টা করেও পারভীনকে যখন নির্বৃত্ত করতে পারেন নি তারা তখন তাকে নিয়মিত প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছেন। বহুতল ভবন এবং মার্কেটগুলো থেকে ফেলা নোংরা ময়লায় বেঁচে থাকার ন্যূনতম পরিবেশকেও প্রতিমুহূর্তে বিপর্যস্ত করে চলেছেন তারা।

কিন্তু আজ আর একা নন পারভীন। শহরের আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক, ডাক্তারসহ সুধী সমাজের সবাই আজ তার জন্য সোচ্চার। লড়তে সে জানে, আর বিশ্বাস বিজয় তার হবেই।

মাদকের বিরুদ্ধে জয়ী সংগ্রামী এক নারী সাতক্ষীরার শাহনাজ পারভীন

মোস্তাফিজুর রহমান শাহীন

জীবন লড়াইয়ের বিচিত্রতা মানুষের স্বভাবগত ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। বৈচিত্র্যময় এই লড়াইয়ে যারা টিকে থাকেন তারাই পরিগণিত হন দৃষ্টান্ত হিসেবে। তাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে সমাজ বদল ও দিন বদলের স্বপ্নের বীজ অঙ্কুরিত হয়। আমাদের দেশের নারীরা যুগে যুগে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত হয়েছে এবং হচ্ছে এটা যেমন সত্য, তেমনি তার মধ্য থেকে পরিবর্তনের পথ দেখিয়ে ইতিহাসের অংশ হয়ে আছেন বহু নারী। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত বেগম রোকেয়া, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ইলামিত্র, কুমুদিনী হাজং, সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমামের নাম আমাদের চলার পথের আলোকবর্তিকা। আলোকিত পথ ধরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কিছু নারী আজও এই ক্ষীণ আলোকে প্রজ্জলিত করার দায়িত্ব পালনের আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আলোর পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন সামনের দিকে, এরূপ একজন নারী শাহনাজ পারভীন। অতি সাধারণ এক নারী। কিন্তু সমাজ পরিবর্তন ও নারীর অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তার কিছু অবদান সত্যিই অসাধারণ। সাতক্ষীরা জেলার পাতাখালী গ্রামের শাহনাজ পারভীনকে নিয়ে আমার এই ক্ষুদ্র লেখনী প্রচেষ্টা।

১৯৭৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর শ্যামনগর থানার পাতাখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শাহনাজ পারভীন মিলি। চার বোনের মধ্যে তার অবস্থান দ্বিতীয়। বাবা ডাক বিভাগে চাকরি করতেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে শাহনাজের বাবা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং যুদ্ধ শেষে বাড়ী ফিরে আর কর্মস্থলে ফিরে যান নি। কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করে চলছিল তাদের সংসার। সংসারে আর্থিক অসঙ্গতি না থাকলেও চার বোনের লেখাপড়ার জন্য তা যথেষ্ট ছিল না।

শাহনাজের শিক্ষা জীবন শুরু হয় পাতাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। পাতাখালী দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া শেষে একই জেলার তালা থানার মঙ্গলকান্দীতে অবস্থিত মামারবাড়ি চলে যান এবং খলিশখালী সতীশচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৯০ সালে এই বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করেন শাহনাজ। এসএসসি পাশের পর ভর্তি হন সাতক্ষীরা সরকারী মহিলা কলেজে। এই কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থাতেই ১৯৯১ সালে আনোয়ার সাদাত নামক একজন আইনজীবীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি।

শাহনাজের বিয়ের সময় আনোয়ার সাদাতের আরো একজন স্ত্রী ও দু'টি সন্তান ছিল এবং স্বামীর সাথে শাহনাজের বয়সের পার্থক্যও ছিল অনেক। ফলে সংসারে শান্তি ছিল না বললেই চলে। এরপরও শাহনাজ স্বামীর সাথে শ্যামনগর যান এবং শ্যামনগর মোহসীন কলেজে ভর্তি হন। ১৯৯২ সালে এইচএসসি পাশের পর তিনি পুনরায় সাতক্ষীরা সরকারী মহিলা কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৯৪ সালে বিএ পাশ করেন। ১৯৯৮ সালে 'সাতক্ষীরা আইন কলেজ' থেকে আইন পাশ করার পর ২০০১ সালে রেজিস্ট্রেশন করে আইন পেশার সাথে যুক্ত হন তিনি। উল্লেখ্য যে, বিয়ের পর শাহনাজের স্বামীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার মায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় শাহনাজের লেখাপড়ার গতি সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

সাতক্ষীরার পলাশপোল (বউ বাজার) এলাকায় আনোয়ার সাদাত দু'টি বাড়িতে তার দুই স্ত্রী'কে রাখতেন। মনে দুঃখ, ক্ষোভ থাকলেও উভয়েই তা মেনে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলছিলেন। সাতক্ষীরার পলাশপোল এলাকাটি ছিল মাদক ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসীদের আখড়া। 'আ' আদ্যাক্ষরের জনৈক ব্যক্তি পলাশপোল এলাকায় মাদক ও নারীদেহ ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপকর্মের সাথে জড়িত ছিলেন। মূলত একটি মুদির দোকানের আড়ালে তিনি তার অবৈধ ব্যবসাগুলো পরিচালনা করতেন। কথিত রয়েছে যে, স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের লোকদের সাথে অবৈধ লেন-দেন ও সখ্যতার সুযোগে তিনি এই অপকর্মগুলো একরকম নির্বিঘ্নেই পরিচালনা করতেন। কেউ তার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পেতেন না। এমনকি প্রতিবাদ করার অপরাধে অনেককে বিভিন্নভাবে নির্যাতিত ও এলাকা ছাড়তে হয়েছিল। অবৈধ এই ব্যবসাগুলোকে কেন্দ্র পলাশপোল এলাকার পরিবেশ ক্রমেই কুলষিত হয়ে ওঠে। চুরি, ছিনতাই প্রভৃতি বিষয়গুলো ছিল এলাকার দৈনন্দিন ঘটনা। পাড়ায়

গৃহবধূ এবং কিশোরী মেয়েদের জন্য চলাফেরা করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। মহল্লার উঠতি বয়সের ছেলেরা মাদকাসক্ত হতে শুরু করে। মাদকের টাকা সংগ্রহের জন্য তারা নিজেদেরকে চুরি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপকর্মের সাথে জড়াতে থাকে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে প্রতি ঘরেই দু-একজন করে মাদকাসক্ত হতে থাকে। এমনকি শাহনাজের সতীনের দুই সন্তানও মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। বিষয়টি শাহনাজের জন্য কিছুটা হলেও অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মাদকাসক্তের এই বিষয়গুলো নিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে অসন্তোষ বিরাজ করলেও কেউ এতদিন কিছু বলার সাহস করেন নি। কিন্তু ২০০৫ সালের শেষের দিকে নিজ সন্তানরা বিপথগামী হতে শুরু করলে এলাকার মায়েরা একত্রিত হয়ে শাহনাজের শরণাপন্ন হন। শাহনাজ প্রথম থেকে মহল্লার এসব অপকর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকলেও পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে বড় ধরনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু সুযোগ পেয়ে তিনি এর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মহল্লার সকল মহিলাদের একত্রিত করে গড়ে তোলেন 'নবোদিত মহিলা সংঘ' নামে একটি সংঘ। সংঘের মূল কাজ ছিল পলাশপোল এলাকার সামাজিক উন্নয়ন এবং মহল্লাকে মাদকামুক্ত করা। তারা মাদক ব্যবসায়ীর বাড়িতে কোন ব্যক্তি এলে সাইরেন বাজিয়ে একত্রিত হয়ে এর প্রতিবাদ করতে শুরু করেন। মহিলারা সভা করে শাহনাজের নেতৃত্বে মাদক ব্যবসায়ীকে তার মাদক ব্যবসা (মুদির দোকান) বন্ধ করতে বলেন। প্রথমদিকে মাদক ব্যবসায়ী কোন ভ্রূক্ষেপ না করায় শাহনাজের নেতৃত্বে মহিলারা মাদক ব্যবসায়ীকে তার এই ব্যবসা বন্ধের জন্য এক সপ্তাহ সময় বেঁধে দেন। সাথে সাথে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন, 'যদি মাদক ব্যবসায়ী বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে তার এই ব্যবসা বন্ধ না করেন তবে তারা তার সকল ব্যবসা গুড়িয়ে দেবে এবং তাকে এলাকা ছাড়া করবেন।' এরই মাঝে মাদক ব্যবসার একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'নবোদিত মহিলা সংঘ'-এর সাথে মাদক ব্যবসায়ীর বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। এসময় প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং মাদক ব্যবসায়ীর স্ত্রী'কে গ্রেফতার করলে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়। এসময় মহিলারা মাদক ব্যবসায়ীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মহল্লা ছেড়ে যাওয়ার জন্য চাপ দিতে শুরু করেন। শাহনাজের স্বামী আনোয়ার সাদাতসহ এলাকার সকল জনসাধারণ এতে অংশ নেয় এবং এটি একটি গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। মাদক ব্যবসায়ী বিষয়টি নিয়ে পৌরসভায় বিচার দেন এবং বিচারের রায়ে মাদক ব্যবসায়ীকে পরবর্তী এক মাসের মধ্যে (ফেব্রুয়ারি, ২০০৬) এলাকা ছেড়ে যেতে বলা হয়। পরবর্তীতে মাদক ব্যবসায়ী রায় মানতে গড়িমসি শুরু করে এবং পৌরসভা থেকে সময় বাড়িয়ে আনে। এরূপ পরিস্থিতিতে ২০০৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি জনৈক ব্যক্তি মাদক ক্রয় করতে ব্যবসায়ীর বাসায় প্রবেশ করলে শাহনাজের নেতৃত্বে মহিলারা সাইরেন বাজিয়ে একত্রিত হয়ে তার দোকানে তালা লাগিয়ে দেয়। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে মহল্লার সকল বাসিন্দা একত্রিত হয়ে মহিলাদের পক্ষাবলম্বন করলে জনরোষের ভয়ে মাদক ব্যবসায়ী তার মালামালসহ সে দিনই এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং শেষ পর্যন্ত এলাকা ত্যাগ করে।

প্রায় সাত মাস পর মাদক ব্যবসায়ী প্রশাসনের বিভিন্ন ব্যক্তির উপস্থিতিতে এলাকাবাসীর সাথে 'ভবিষ্যতে আর অবৈধ কোন ব্যবসার সাথে যুক্ত হবে না' এই মর্মে অঙ্গীকারের মাধ্যমে আপোস করে তার পৈত্রিক ভিটায় ফিরে আসে। বর্তমানে

সাতক্ষীরার পলাশপোল এলাকার অবস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক ভালো বলে জানালেন শাহনাজ বেগম। শাহনাজের ভাষায়, এ কাজে স্বামী আনোয়ার সাদাত, আফরোজা খাতুন, ফিরোজা খানম, মমতাজ খানম, মাছুরা বেগম, লতিফা আনাম, ফিরোজা খানমসহ প্রায় দু'শতাধিক মহিলা ও পুরুষ তাকে সার্বক্ষণিক সহায়তা করেছিল।

২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'নবোদিত মহিলা সংঘ' সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে রেজিস্ট্রেশন লাভ করে। সংঘের বর্তমান সদস্য প্রায় ৬৫ জন মহিলা। সংঘের সদস্যরা মাসে ১০ টাকা করে সঞ্চয় জমা করছেন। সংঘের সকল লেন-দেন যৌথ স্বাক্ষরে আইএফআইসি ব্যাংক, সাতক্ষীরা শাখার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। জমাকৃত এই টাকা থেকে মহল্লার দরিদ্র্য ঘরের মেয়েদের বিয়ে, গরীবদের শীতবস্ত্র বিতরণসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। ২০০৭ সালের শীতকালে সংঘের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ জনের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

আইন পেশার সাথে জড়িত থাকা এবং পলাশপোল মহল্লার মাদক বিরোধী অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়ার ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের সাথে শাহনাজের সখ্যতা গড়ে ওঠে এবং পরিচিতি বাড়তে থাকে। পরিচয়ের সূত্র ধরে স্থানীয় উজ্জীবক রাবেয়া খলিল শাহনাজকে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। প্রশিক্ষণের পূর্ব থেকে শাহনাজের কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আমন্ত্রণ পাওয়ার পর তিনি ২০০৬ সালের ৭ থেকে ১০ আগস্ট সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবে আয়োজিত ১০২৭তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। শাহনাজ জানান নারীর ক্ষমতায়ন এবং সমাজের অবহেলিতদের জন্য কাজ করার ইচ্ছা তার পূর্ব থেকে থাকলে প্রশিক্ষণের পর এর পরিধি বৃদ্ধি পায় এবং এক ধরনের দায়িত্ববোধের সৃষ্টি হয়। তাই প্রশিক্ষণ চলাকালে তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন যে, সমাজের অবহেলিত নারী ও শোষিতরা আনুষঙ্গিক ব্যয় প্রদান করতে না পারলেও তিনি তাদেরকে বিনামূল্যে আইনী সহায়তা প্রদান করবেন।

শাহনাজ মূলত পারিবারিক মামলাগুলো পরিচালনা করে থাকেন। দরিদ্র্য ও দুঃস্থ মহিলাদের তিনি বিনামূল্যে আইনী সহায়তা প্রদান করে চলেছেন। এ পর্যন্ত তিনি যাদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আইনী সহায়তা প্রদান করেছেন তাদের মধ্যে ফাতেমা বেগম, হাসিনা বেগম, শার বানু, রেজিয়া খাতুন এবং মর্জিনার নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা সবাই সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন থানার বাসিন্দা। এছাড়া তিনি আংশিক কিংবা নামমাত্র পারিশ্রমিক নিয়ে প্রায় পঁচিশ জনকে আইনী সহায়তা প্রদান করেছেন। বর্তমানে প্রায় দশটি মামলা তিনি বিনামূল্যে পরিচালনা করছেন। শাহনাজ মূলত পারিবারিক মামলাগুলো পরিচালনা করলেও এলাকার যৌতুক, তালাক, বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহসহ সব ধরনের নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার। এরূপ কোন ঘটনা ঘটলে শাহনাজ তার পরিচিত আইনজীবীদের মাধ্যমে বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আইনী সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকেন।

সাতক্ষীরার নারী নির্যাতন প্রতিরোধের সকল ধরনের আন্দোলন, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস, জাতীয় কন্যাশিশু দিবসসহ বিভিন্ন দিবস পালনে তিনি থাকেন সামনের কাতারে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানতে চাইলে শাহনাজ বলেন, দেশের অবহেলিত ও নির্যাতিত নারীদের আইনী সহায়তা এবং আশ্রয় দেওয়ার জন্য ক্ষুদ্র আকারে হলেও একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ইচ্ছে রয়েছে তার। যেখানে প্যানেলভুক্ত কয়েকজন আইনজীবী থাকবেন এবং তারা বিনামূল্যে এ সকল নারীদের আইনী সহায়তা প্রদান করবেন। বর্তমানে তিনি এক কন্যা সন্তানের জননী। শিশুটি দ্বিতীয় শ্রেণিতে লেখাপড়া করে। শাহনাজের স্বপ্ন তার কন্যা সন্তান মৌ একদিন বড় হয়ে তারই মত দেশের অবহেলিত ও নির্যাতিত নারীদের আইনী সহায়তা প্রদান করবে। এজন্য তিনি তার সন্তানকে আইন পেশার সাথে যুক্ত করতে চান। আমাদেরও প্রার্থনা শাহনাজের স্বপ্ন পূরণ হবে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশে আর কোন নারীকে নিগৃহীত হতে হবে না। যৌতুকের দায়ে বলি হতে হবে না আর কোন রিমাকে। শূন্য হবে না আর কোন মায়ের কোল। গড়ে উঠবে নারী নির্যাতনমুক্ত এক বাংলাদেশ যেখানে নারী ও পুরুষ একে অপরের দিকে তাকাবে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে।

সালমা রহমান হ্যাপী : মানব সেবার এক অনন্য দৃষ্টান্ত

মোস্তাফিজুর রহমান শাহীন

পিরোজপুর সদর হাসপাতালের আয়া, নার্স, ডাক্তার, সিভিল সার্জন সবাই হ্যাপী নামটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। হাসপাতালে রোগী নিয়ে সালমা রহমান হ্যাপীর নিত্য যাতায়াত। গ্রামের বা আশ-পাশের গ্রামের গরিব ও স্বল্প শিক্ষিত অসুস্থ মানুষ ছুটে যায় হ্যাপীর নিকট। হ্যাপী তাদের নিয়ে যান হাসপাতালে। সরকারি হাসপাতালে গরীব বলে কর্তৃপক্ষ এসব রোগীদের অবহেলা করতে পারে না, সেবা দিতে বাধ্য হয়। নিজে অর্থ দিয়ে, অন্যদের নিকট থেকে সহায়তা নিয়ে এইসব রোগীদের নিঃস্বার্থভাবে সেবা করে যান হ্যাপী। চিকিৎসা সেবা ছাড়াও এলাকার বঞ্চিত, নির্যাতিত নারীর পক্ষের শক্তি হয়ে বিরামহীন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে পিরোজপুর জেলার কাউখালীর আমলাঝুড়ি গ্রামে হ্যাপীর জন্ম। সন্ধ্যা নদীর তীরে বেড়ে ওঠা এই মানুষটির মনে জলজ প্রকৃতির গাঢ় ছাপ পড়ে। তৈরি হয় আকর্ষণ, ভালবাসা। একারণেই হ্যাপী কেন্দ্রমুখী, নগরমুখী তথা রাজধানীমুখী হতে পারেন নি। শুধু জল-সংলগ্ন মানুষগুলোকে ভালোবেসে নিজ এলাকায় প্রোথিত শিকড়কে আরো শক্ত করেছেন।

তিন ভাই চার বোনের সংসারে হ্যাপীর অবস্থান সপ্তম। তার শৈশবে সংঘটিত হয় আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। গোটা পরিবারটি যুক্ত হয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। শহীদ হন বড় ভাই মুক্তিযোদ্ধা ওমর ফারুক। যুদ্ধ শেষে শান্ত প্রকৃতির অথচ কর্মচঞ্চল হ্যাপীর পাঠ শুরু হয় গ্রামের পাঠশালায়। ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া করলেও ১৯৭৯ সালে কুষ্টিয়া গার্লস স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং এখান থেকে ১৯৮৩ সালে এসএসসি পাশ করেন। কুষ্টিয়ায় বড় বোনের বাসায় থেকে লেখাপড়া চালাতেন। এসএসসি পাশ করার পর পারিবারিকভাবে পিরোজপুরের আমলা পাড়ার রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান মুজিবুর রহমান খালেকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পর হ্যাপী পুনরায় পিরোজপুরে চলে আসেন এবং পিরোজপুর সরকারী কলেজে ভর্তি হন। ১৯৮৫ সালে এই কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন।

হ্যাপীর বাবা সৈয়দুর রহমান পেশায় ছিলেন একজন সরকারি চাকুরে এবং ব্যক্তি হিসেবে ছিলেন খুবই জন-দরদী প্রকৃতির। গরীব ও অসহায়দেরকে সহযোগিতা করা ছিল তার জীবনের ব্রত। ফলে শৈশব থেকে হ্যাপীর মধ্যে সমাজের গরীব ও অসহায়দের সহযোগিতা করার মানসিকতা গড়ে ওঠে। অন্যদিকে বিয়ের পর দেখেন যে, রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণে তার স্বামী, শ্বশুর-শ্বাশুড়িসহ পরিবারের অধিকাংশ সদস্য কোন না কোনভাবে জনগণের সাথে সম্পৃক্ত। বিষয়গুলো হ্যাপীকে জনগণের সাথে কাজ করতে আরো বেশি উৎসাহিত করে তোলে। এরূপ এক পরিস্থিতিতে ১৯৮৬ সালে সন্তান সম্ভবা হন তিনি। ফলে জনগণের সাথে কাজের সুযোগ অনেকটা কমে যায়। ১৯৮৭ সালে হ্যাপী তানভির মুজিব অভি এবং ১৯৯১ সালে তৌকির মুজিব আবির নামে দু'টি সন্তানের জন্ম দেন।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাস। মহল্লার হালিমা নামক এক মহিলা হ্যাপীর স্বামীর কাছে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহযোগিতা চাইতে আসে। বাসায় স্বামী অনুপস্থিত থাকায় হ্যাপী মহিলাটির সাথে আলাপ করে জানতে পারেন যে, তিনি যক্ষ্মায় আক্রান্ত এবং স্থানীয় একটি ক্লিনিক থেকে তার কাছে চিকিৎসার জন্য ৭৫০ টাকা সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। হ্যাপী মহিলাটির সাথে ক্লিনিকে গিয়ে আরো জানতে পারেন, শহরের যে কোন প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসা করাতে গেলে একই রকম খরচ পড়বে। কিন্তু সরকারি টিবি হাসপাতালে গেলে খরচ খুব কম হবে। তিনি হালিমাকে নিয়ে পিরোজপুর সরকারী টিবি হাসপাতালে যান এবং সেখানকার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে মাত্র দুই টাকা দিয়ে একটি টিকিট কিনে হালিমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এভাবে ৭৫০ টাকার হিসাব মাত্র ২ টাকার মাধ্যমে সমাধান হয়। বিষয়টি হ্যাপীর মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। তিনি ভাবতে থাকেন যে, এই গরীব মানুষগুলোকে যৎসামান্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করার চেয়ে সঠিক পথ ও পরামর্শ প্রদান করাটা হবে অনেক শ্রেয়। বিষয়টি নিয়ে হ্যাপী স্বামীর সাথে আলাপ করেন এবং বাড়িতে আসা

অসহায় দুঃস্থদের নিয়মিতভাবে হাসপাতালে নিয়ে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করতে থাকেন। ক্রমেই সমগ্র এলাকায় হ্যাপীর নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং সহযোগিতার জন্য আসা প্রার্থীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে থাকে। খুব দ্রুত হ্যাপীর কাজের পরিধি চিকিৎসা সহযোগিতার গণ্ডি ছাড়িয়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পর্যন্ত গড়ায়। প্রতিনিয়ত তার কাছে অসংখ্য নির্যাতিত নারী সহযোগিতার জন্য আসতে শুরু করে। হ্যাপীও তাদেরকে সামর্থ অনুযায়ী সহযোগিতা করতে থাকেন। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা হল:

এক. পিরোজপুর শহরের কুমারখালী এলাকার আনোয়ারা খাতুন ১৯৯৮ সালের জুন মাসে এক জটিল স্ত্রীরোগে আক্রান্ত হয়ে হ্যাপীর শরণাপন্ন হন। হ্যাপী তার চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালের চিকিৎসকের সাথে আলোচনা করেন এবং আনোয়ারার জড়ায়ু অপারেশন করা হয়। কিন্তু অপারেশনের তিন মাস পর দেখা যায় যে আনোয়ারা গর্ভবতী। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে চিকিৎসকের সাথে হ্যাপীর মনোমালিন্য ঘটে। শেষ পর্যন্ত মাত্র সাত মাসের ব্যবধানে আনোয়ারার আর একটি অপারেশন করে সন্তান প্রসব করানো হয়। ইতোমধ্যে আনোয়ারার স্বামী আনোয়ারাকে ফেলে উধাও হয়ে যায়। ফলে হাসপাতালে অপারেশনের সকল খরচ হ্যাপী নিজে পরিশোধ করে তাকে বাসায় নিয়ে আসেন। পরবর্তী সময়ে তিনি আনোয়ারাকে সেলাই প্রশিক্ষণ ও পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করে দেন। বর্তমানে আনোয়ারা সেলাইয়ের কাজ করে তার জীবিকা নির্বাহ করছেন এবং তার সন্তানরা লেখাপড়া করছে।

দুই. পিরোজপুর শহরের পারের হাট মহল্লার ফারুক যৌতুকের দাবিতে তার স্ত্রী ফাতেমাকে নিয়মিত নির্যাতন করতেন। মাঝে মাঝে ফাতেমার শ্বশুর শ্বাশুড়িও এই নির্যাতনে যোগ দিত। ২০০৩ সালের শেষের দিকে ফাতেমা গর্ভবতী থাকা অবস্থায় ফারুক অপর একটি মেয়েকে বিয়ে করে ঢাকায় চলে যায়। এরপর ফারুকের বাবা-মা ফাতেমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং ফাতেমা হ্যাপীর বাসায় আশ্রয় নেয়। হ্যাপী তাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেয় এবং সেখানে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে ফাতেমা। হাসপাতাল থেকে রিলিজ পেয়ে ফাতেমা পুনরায় হ্যাপীর বাসায় ওঠে। বিষয়টি নিয়ে হ্যাপী ফারুকের বাবা-মা'র সাথে যোগাযোগ করেন। প্রথমে তারা বউকে ঘরে তুলতে অস্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত স্থানীয় থানা, মহিলা পরিষদ এবং হ্যাপীর যৌথ প্রচেষ্টায় এবং তাদের উপস্থিতিতে ফারুক এবং তার বাবা-মা 'ভবিষ্যতে আর ফাতেমাকে নির্যাতন করবে না' এই মর্মে সকলের সামনে একটি দলিলে স্বাক্ষর করে ফাতেমাকে ঘরে তুলে নেন। ফাতেমার স্বামী এখন ঢাকা থেকে নিয়মিত বাড়িতে এসে ফাতেমার খোঁজখবর নেন এবং তার সকল ব্যয় নির্বাহ করেন। বর্তমানে ফাতেমার সন্তানরা স্কুলে লেখাপড়া করছে এবং ফাতেমা পূর্বের তুলনায় বেশ ভালোই আছে।
উপরিউক্ত দু'টি ঘটনার বাইরেও তিনি আঞ্জুরানী হাওলাদার, মিলি মৃধা, সোহেলী আক্তার শান্তা, লাকী আক্তার, মুর্শিদা বেগম, নাজমা বেগম, মিতা রানী শিকদারসহ প্রায় দু'শতাধিক নির্যাতিত, স্বামী পরিত্যক্তা নারীকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন।

একদিকে রাজনৈতিক পরিবারের বউ অন্যদিকে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের সাথে জড়িত থাকার ফলে হ্যাপীর পরিচিতি দিন দিন বাড়তে থাকে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রভৃতির সাথে বেশ সখ্য গড়ে ওঠে। এরই সূত্র ধরে পিরোজপুর পৌরসভার মহিলা কমিশনার এবং দৈনিক ইত্তেফাকের স্থানীয় প্রতিনিধির আমন্ত্রণে ২০০৫ সালের ৯ থেকে ১২ ডিসেম্বর পিরোজপুর পুরাতন ডিসি অফিস মিলনায়তনে অনুষ্ঠেয় ৮৫৪তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি। প্রশিক্ষণে নারীর ক্ষমতায়ন অংশটি হ্যাপীকে ভীষণ আকৃষ্ট করে। হ্যাপী বলেন, প্রশিক্ষণের অনেক পূর্ব থেকে তিনি নির্যাতিত মহিলাদের বিভিন্ন অধিকার নিয়ে কাজ করলেও তা ছিল অনেকটাই অগোছালো। কিন্তু প্রশিক্ষণের পর তিনি এই কাজগুলোকে গুছিয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে নিতে থাকেন। যার ফলে উপকারভোগীর সংখ্যা যেমন বাড়তে থাকে তেমনি অধিক সফলতার কারণে হ্যাপীও মানসিকভাবে তৃপ্ত হতে থাকেন। এছাড়া আদর্শ গ্রামের স্বপ্ন, আত্মনির্ভরশীলতা, জ্ঞানের রাজ্য প্রশিক্ষণের প্রভৃতি পর্বগুলো তার বেশ ভালো লেগেছিল। প্রশিক্ষণ সম্পর্কে হ্যাপী আরো বলেন, "আগে ভাবতাম মানুষ কেন মানব সেবায় এগিয়ে আসে না? 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র চারদিনের প্রশিক্ষণ থেকে আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। মানুষ অসচেতন, মানুষের আত্মশক্তি সুপ্ত, অসচেতন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, এতে জেগে ওঠবে তাদের সুপ্ত শক্তি। ফলে মানব সেবায় মানুষ এগিয়ে আসবে, সমাজ পরিবর্তিত হবে"।

প্রশিক্ষণের শেষ দিন হ্যাপী মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন যে, প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে পিরোজপুর পৌরসভার দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের উন্নয়নের জন্য তাদেরকে নিয়ে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে বড় পরিসরে কাজ শুরু করবেন। প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে তিনি পৌরসভার মোট ৯টি ওয়ার্ড থেকে ৩০ জন মহিলা নিয়ে একটি সভার আয়োজন করেন। সভায় আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই ৩০ জন মহিলা বেশ কয়েকটি সভায় মিলিত হন এবং পরবর্তীতে বৃহৎ পরিসরে কাজ করার লক্ষ্যে ৭০ জন নারীকে নিয়ে পিরোজপুর মুকুলফৌজ হল রুমে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ৯৭৬তম ব্যাচের প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। হ্যাপীর কাছে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের একটি তালিকা ছিল, সেই তালিকা অনুযায়ী তিনি নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ এবং তাদের কার্যক্রম তদারকি করতে থাকেন। একেবারেই উপায়হীন মহিলাদের জন্য তিনি পিরোজপুরের উজ্জীবক মিজানের সহায়তায় সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণের সকল খরচ হ্যাপী নিজে বহন করেন। মিজানের কাছ থেকে সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে পারভীন বেগম, শুকুরী বেগম, শাহিদা বেগম, শামিমা বেগম এবং মণিসহ প্রায় ১০ জন মহিলা বর্তমানে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। উল্লিখিত মহিলাদের মধ্যে শাহিদা বেগমকে হ্যাপী নিজে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করে দিয়েছিলেন। অপর একজন উজ্জীবকের সহায়তায় তিনি প্রায় ৮৫ জন মহিলাকে নিয়ে 'কারচুপি' প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের মধ্যে ২৭ জন মহিলা কারচুপির কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে।

বিত্তহীন মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে পিরোজপুরে বড়ির সাথে 'সূচনা বুটিক হাউজ' নামে একটি ব্লক বাটিকের কারখানা স্থাপন করেন হ্যাপী। এই কারখানায় টেইলারিং ও ব্লক বাটিকের কাজ এক সাথে চলতে থাকে। পাশাপাশি বিনামূল্যে মহিলাদের প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়। শুরুতে এই কারখানার জন্য ৫০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করেন হ্যাপী। বর্তমানে প্রশিক্ষকের অভাবে সেলাইয়ের কাজটি বন্ধ থাকলেও ব্লক বাটিকের কাজ চলমান। এখানে কাজ করে ৬ জন মহিলা তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। হ্যাপী জানান, 'সূচনা বুটিক হাউজ' থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এবং এই বৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে প্রায় ১৭ জন নারী আজ আত্মনির্ভরশীল।

হ্যাপী জানান পিরোজপুর অঞ্চলে ধর্মান্ধতা এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রচলন অন্যান্য এলাকার তুলনায় একটু বেশি। তাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণ এবং শিশুদের মনন বিকাশের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'শহীদ ওমর ফারুক আর্ট একাডেমি'। এই প্রতিষ্ঠান থেকে শিশুদের নাচ, গান ও চিত্রঙ্কন শেখানো হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে প্রায় অর্ধ শতাধিক শিশু তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি মননের বিকাশ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৪ জন এবং ১ জন পিয়ন কাম আয়া রয়েছেন। এই একাডেমির ব্যানারে হ্যাপী গড়ে তুলেছেন একটি স্বেচ্ছাসেবী রক্তদাতা গ্রুপ। প্রায় পাঁচ শতাধিক ব্যক্তির রক্তের গ্রুপের একটি তালিকা তৈরি করে রাখা হয়েছে। সন্ত ান প্রসব থেকে শুরু করে যে কোন প্রয়োজনে দুঃস্থ ও অসহায় লোকদের রক্তের প্রয়োজন হলে তাদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রক্ত প্রদান করা হয়। এমনকি রক্তের গ্রুপ ম্যাচিং এবং রক্তের ব্যাগের মূল্য পর্যন্ত একাডেমির তহবিল থেকে বহন করা হয়।

হ্যাপী সর্বদাই অন্যের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করেন। তার প্রতি এক ধরনের ভরসা বা নির্ভরশীলতা তৈরি হয়েছে জনগণের। সবাই তাকে ভালোবাসে। তার কর্ম উদ্দীপনা এবং সেবাব্রতী মন দেখে পিরোজপুর মহিলা পরিষদ তাকে আমন্ত্রণ জানায়। স্বতঃস্ফুর্তভাবে যোগ দেন হ্যাপী। হ্যাপীর মনে হয় মহিলা পরিষদে যুক্ত হলে তিনি মানব সেবায় কৌশলগত সহযোগিতা পাবেন। পেয়েছেনও। হ্যাপী এখন পিরোজপুর জেলা মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক।

উজ্জীবক হ্যাপীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার পরিবার কি আপনাকে কোনভাবে অসহযোগিতা করে? উত্তরে হ্যাপী বলেন, "না, তবে বর্তমানে এলাকার আপামর জনগণ আমাকে জন প্রতিনিধি হিসাবে চায়। কিন্তু আমার পরিবার সব কাজে সহযোগিতা করলেও এ ব্যাপারে দারুণ রক্ষণশীল ভূমিকা পালন করে"।

সালমা রহমান হ্যাপীর দুই ছেলে, বড় ছেলে কলেজে এবং ছোট ছেলে স্কুলে পড়ে। স্বামী ব্যবসায়ী, নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। জীবনটাকে তাই উৎসর্গ করতে চান মানব সেবায়, বিশেষত নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ও নারী উন্নয়নে। এগিয়ে যেতে চান, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ বিশেষত বিত্তহীন মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে। পাড়ি দিতে চান আরো অনেক পথ। যার মাধ্যমে সমাজের সকল অন্যায় ও অশুভ শক্তিগুলোকে পরাজিত করে তার শহীদ ভাই ওমর ফারুকসহ সকল শহীদদের চেতনার ভিত্তিতে গঠিত হবে একটি নতুন সমাজ। হ্যাপীর আশঙ্কা সেবাকর্ম থেকে বিচ্যুত হলে হয়ত তিনি বাঁচবেন না। সালমা রহমান হ্যাপী বেঁচে থাকুক। তার স্বেচ্ছাব্রতী জীবন অর্থপূর্ণ হবে। তার চেতনার স্পর্শে, মানবতাময়ী আলিঙ্গনে জেগে উঠুক আরো হাজারো নারী।

এ আগুন ছড়িয়ে পড়ুক সবখানে

তুহিন আফসারী

বাংলার মানুষকে কখনো পরাধীনতার জালে আটকে রাখা যায় নি অন্তত ইতিহাস তাই বলে। কিন্তু বারবার শৃঙ্খলিত স্বাধীনতাকে মুক্ত করার জন্য যে মূল্য দিতে হয়েছে সেটাও ইতিহাসে বিরল। 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র ভিত্তিতে উপমহাদেশ যখন বিভক্ত হয়ে পড়লো তখন সব থেকে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছিলো পূর্ব পাকিস্ত্মানের সাধারণ মানুষ, যারা এই ক্ষমতার টানাপোড়নের অংশ ছিলেন না। দুই পাকিস্ত্মানের ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দুরত্বকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দূরত্বও বাড়ছিল দিনদিন। ৫২, ৬২, ৬৬ এবং ৬৯ গণ-আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এই দূরত্ব থেকে তৈরি ক্ষোভ ও বঞ্চনার বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৭১ সালে। ভোট বিপ্লবে স্বাধীকার না পেয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধমে বিশ্বের মানচিত্রে জন্ম নেয় ৫৬ হাজার বর্গ মাইলের বাংলাদেশ নামক নতুন একটি দেশের। নতুন এই দেশটির জন্য যে মূল্য দিতে হয়েছে এদেশের নারীদের তার যথাযথ মূল্যায়ন হয়েছে কিনা সেই চলমান বিতর্কে আজ নাই বা গেলাম। এই লেখা সেই মূল্যায়ন করার দুঃসাহস ও রাখেনা এবং উদ্দেশ্য ও সেটা নয়। বরং চরম মূল্য দেওয়া একজন নারীর বঞ্চনা, হতাশা এবং তা থেকে লড়াই করে বের হয়ে আসার অনুকরণীয় গল্প আপনাদের সামনে তুলে ধরাটাই মুখ্য।

কিশোরগঞ্জ জেলার সচেতন মানুষ মাত্রই দিপীকা রানী দাসের নাম জানে। শান্ত স্বভাব, মার্জিত আচরণ, গঠনমূলক চিন্তা আর স্বেচ্ছাব্রতী মনোভাব গোটা জেলায় দিপীকার আলাদা একটি পরিচয় তৈরি করে দিয়েছে। তার অর্জিত গুণাবলী তাকে আজ সামাজিকভাবে অনন্য একটি অবস্থান তৈরি করে দিয়েছে। অথচ দিপীকার আজকের এই অবস্থানে আসার পেছনে কি পরিমাণ কষ্ট, যন্ত্রণা আর বঞ্চনাকে জয় করতে হয়েছে তা অনেকেরই অজানা। এই অজানা কাহিনীকে জানার জন্য চলুন একটু পেছন ফিরে দেখা যাক।

১৯৭১ সাল। চারিদিকে চলছে সশস্ত্র মুক্তির সংগ্রাম। শহর থেকে ভয় পাওয়া নিরাপত্তাহীন মানুষের ভীড় ক্রমাগতভাবে গ্রামমুখী হচ্ছিল। যারা গ্রামেও স্বস্তি পাচ্ছিলেন না তারা পাড়ি জমাচ্ছিলেন সীমান্তের ওপারে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরে শাসক ও তার দালালদের প্রতিহিংসা বেশি ছিল বলে অনেক পরিবারই পাড়ি জমিয়ে ছিলেন পার্শ্ববর্তী দেশে। আর যারা দেশে ছিলেন তাদের দিতে হয়েছিল চরম মূল্য । অস্থির সেই সময়ে যখন শঙ্কা আর ভয়ের টানাটানি চলছিল তখন অনেকেই সেই ভয়ের কাছে মাথা নত করেন নি। বুক চিতিয়ে তারা রয়ে গিয়েছিলেন এই দেশমাতৃকার বুকে। দিপীকার দাদু বিপিন দাস ও বাবা প্রত্যুষ চন্দ্র দাস ছিলেন সাহসী সেই দলের মানুষ।

চারিদিকে যখন পলায়নরত মানুষের ভীড় ক্রমাগতভাবে বাড়ছিল তখন গ্রামের মানুষের প্রতি অসম্ভব আস্থা ও বিশ্বাসের কারণে সেই মিছিলে যোগ দেন নি ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ থানার আঠারোবাড়ী ইউনিয়নের রাজীবপুর গ্রামের "বড়বাড়ী"র সদস্যরা। বাড়ীর বয়োজেষ্ঠ সদস্য বিপিন দাস ও তার পুত্র প্রত্যুষ চন্দ্র দাস ব্যবহার ও বিত্তে গ্রামের প্রভাবশালী হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন। গ্রামে থেকে গ্রামের যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা ও তাদের ভারতে প্রশিক্ষণে পাঠানো এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করা ছিল তাদের মহান ব্রত। সারা দেশে যখন প্রতিরোধ আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠছিলো তখন শাসক ও তাদের দালালরা সমগ্র দেশে দেশপ্রেমী, উদার ও প্রগতিশীল মানুষদের চিহ্নিত করে হত্যা করতে থাকে। সেই নীল নকশার ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর স্থানীয় রাজাকার শহর আলীর নেতৃত্বে ঘেরাও করা হয় 'বড়বাড়ী'। ধরে নিয়ে যাওয়া হয় পিতা পুত্রকে। ২৩ তারিখ বিকেলে কেন্দুয়ার বঙ্গানীয়া পুলের উপর দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয় বিপিন দাস ও প্রত্যুষ চন্দ্র দাসকে। শহীদ হন মহান দুই দেশপ্রেমিক যোদ্ধা। শহীদ প্রত্যুষ চন্দ্র দাসের ২৮ বছর বয়সী স্ত্রী বীনা রানী দাস তখন ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা আর কোল জুড়ে এক বছর বয়সী দিপীকাসহ আরো তিন সন্তান। দেশকে স্বাধীন করতে যে নারী তার সব থেকে মূল্যবান সম্পদ বিসর্জন দিয়েছে সে অন্তত প্রতিদান আশা না করলেও স্বীকৃতি ও সম্মান আশা করতে পারেন। বীনা রানীর প্রার্থনাও এমনটিই ছিলো। আর কিছু না হোক সবার সহযোগিতায়

নিজের ছেলেমেয়েদের মানুষ করবেন। তার প্রার্থনাটি দেবতার পছন্দ হয়েছিল কিন্তু উল্টোভাবে। যার ফলে পাঁচ সন্তানকে নিয়ে বীনা রানীকে শুরু করতে হয়েছিল জীবনের নতুন যুদ্ধ।

দিপীকার বড় দাদা যেহেতু নাবালক ছিলো তাই তাদেরকে বঞ্চিত করার জন্য দিপীকার দুই কাকা উঠে পড়ে লাগে। শুরু হয় দ্বন্দ্ব আর মনোমালিন্য। এ সময় থেকে আরো বেশি অসহায় হয়ে পড়েন দিপীকার মা বীনা রানী। এ সময় তাদের বেঁচে থাকার মতো সামান্য ফসল দেওয়া হতো। সামান্য এই ফসল বাঁচিয়ে রাখে দিপীকাদেরকে। চলমান এই কষ্টের মধ্যেই দিপীকাকে ভর্তি করানো হয় গ্রাম থেকে দুই মাইল দূরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তাদের পড়াশুনা করানো মোটেই পছন্দ করে নি তার কাকারা। তাই প্রতি নিয়ত মানসিক নির্যাতন চালানো হতো তার মায়ের উপর। এটা ছিলো ৭৮/৭৯ সালের ঘটনা। এ সময়ে একদিন সাত আট দিনের জন্য কিশোরগঞ্জের মামা বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন তারা। ফিরে এসে দেখেন যে তাদের থাকার ঘরটি দখল হয়ে গিয়েছে। তার বদলে তাদের থাকতে দেওয়া হয় ছোট্ট মাটির ঘরে।

এত কষ্টের মধ্যেও মায়ের প্রেরণা, বড় দাদার সহযোগিতা ও নিজের চেষ্টায় পঞ্চম শ্রেণিতে দ্বিতীয় গ্রেডে বৃত্তি পান দিপীকা। এই অর্জনকে উপভোগ করতে না পারলেও মা আর দাদার চোখের পানি তাকে আন্দোলিত করেছিল। প্রাইমারি স্কুল পাশ করার পর তাকে ভর্তি করানো হয় আঠারোবাড়ী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে। মায়ের উৎসাহে এ সময় গানের চর্চা শুরু করেন দিপীকা। মা ছিলেন তার প্রথম ওস্তাদ। বিনা বেতনে ৬ষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি পাশ করার পর আর বাড়িতে থাকার কোন পরিবেশ ছিল না। তাই ১৯৮৩ সালে বাবা ও মায়ের স্বপ্ন পুরণের জন্য অনেক আশা নিয়ে মামার বাড়িতে আসেন দিপীকা। জন্ম থেকেই দুর্ভাগ্য যার সঙ্গী তার স্বস্তি দেওয়ার ইচ্ছা বিধাতারও থাকে না। তাই মামা মামীর কাছ থেকে আদর স্নেহের পরিবর্তে জুটতে থাকে আরো ভয়ংকর মানসিক নির্যাতন। মানসিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে কে বেশি এগিয়ে এটা প্রমাণ করার জন্য মামা ও মামী কারো চেষ্টাই কম ছিল না। দুজনের অকথ্য নির্যাতন ছাড়াও বাড়ির সমস্ত সদস্য ও আগত অতিথিদের ফরমায়েস মোতাবেক কাজ করতে হতো। এ সময় বাবার কথা খুব মনে পড়তো দিপীকার। একা একা কাঁদার সময় বাবার উপর রাগ হতো। মনে হতো বাবা কেনো মারা গেল। বাবা মারা না গেলে এ কষ্ট কেউ দিতে পারত না তাকে।

কষ্টের মধ্যে এক পশলা স্নেহ ঝরে পড়তো শুধু মাত্র বৃদ্ধা ঠাকুরমার আচরণে। আর কষ্টের সাথী ছিল তিন বছরের অনিমা মাসি। এ দু'জনের কারণে হাজারো কষ্ট দমাতে পারে নি দিপীকাকে। সকাল বিকাল আর সন্ধ্যার কাজ শেষে পড়তে বসতে হতো তাকে। পড়ার সময়ও অদ্ভুত নিয়ম মেনে চলতে হতো, কোনভাবেই জোরে উচ্চারণ করা যাবে না। শব্দ করলেই জুটতো নানা ধরনের শাস্তি। মাঝে মাঝে পড়ার মধ্যেই কাজের ডাক পড়ত। এসব কোন দিনই মাকে জানতে দেন নি দিপীকা। শহরে যখন দিপীকার কষ্টের দিন কাটছিল তখন গ্রামের বাড়িতে অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাবার কারণে মায়ের গহনা বিক্রির টাকা নিয়ে শহরে ব্যবসা করতে আসে সদ্য এসএসসি পাশ করা দিপীকার বড় দাদা লিটন। বড় দাদার এই ব্যবসায় আসা মোটেই সহ্য হয় নি দিপীকার মামার। মামার সম্পত্তির ভাগীদার হবে এই ভয়ে দুই ভাই বোনের উপর অত্যাচারের মাত্রাও বাড়তে থাকে।

দিপীকার দাদুর অগাধ সম্পত্তি ছিলো যা মামার নামে উইল করা। যার মধ্যে কিশোরগঞ্জের বিখ্যাত রঙমহল সিনেমা হল বিভিন্ন ব্যবসা ছিল অন্যতম। কিশোরগঞ্জে এসে স্থায়ী হলে মামার সম্পত্তি হুমকির মুখে পড়বে এই ভয়ে দিপীকার মায়ের গহনা বিক্রি করা টাকায় বাড়ী কিনে নিজের নামে করে নেয় মামা। এছাড়া ব্যবসার জন্য টাকা নিয়ে আর ফেরৎ দেন নি এমন অনেক ঘটনার শিকার হয়েছে এ পরিবারটি। এভাবেই অনেকের দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রতারিত হতে থাকেন তারা।

এ রকম হাজারো টুকরো ঘটনা প্রতিনিয়ত মনে পড়ে দিপীকার। নতুন ক্লাসে উঠার আগে মামার কাছে স্কুল ড্রেস চেয়ে নির্দয় আচরণের শিকার হয়েছিলেন। গান শেখার অপরাধে তার প্রিয় হারমোনিয়ামটি বাড়ীর পাশের পুকুরে ফেলে দিয়েছিলেন মামা।

পরে হারমোনিয়ামটা উদ্ধার করা গেলেও আর ব্যবহার করা যায় নি। নিজের বাবার মামার প্রচুর সম্পত্তি থাকার পরও বিনা বেতনে পড়তে হয়েছে স্কুলে। নিজের পোষাক তৈরির জন্য গভীর রাতে ডিম লাইটের আলোয় উলের জ্যাকেট তৈরি করে ১৫৬ টাকা আয় করেছিলেন। সেটা তার আয়ের শুরু ছিল।

এদিকে শহরে যখন দিপীকার দুর্বিষহ দিন কাটছিল তখন গ্রামের বাড়িতে তার মা আর দিদিদের থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর বড় একটি কারণ ছিল দিপীকার দিদির বড় হয়ে উঠা। তাই অত্যাচার থেকে রক্ষা আর নিরাপত্তার জন্য ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে দিদিমার দেয়া জমির উপর ঘর তুলে চলে আসে তারা। দিপীকা তখন নবম শ্রেণির ছাত্রী। চরশোলাকিয়ার এই বাড়িতে আসার পর আরো কষ্টের মধ্যে পড়ে দিপীকার পরিবার। ভাইয়ের ব্যবসায় লোকসান হলে নিঃস্ব হয়ে পড়ে পরিবারটি। এ সময় কোন আত্মীয়দের কাছ থেকে সামান্য সহযোগিতা পায় নি তারা। এই অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে মায়ের গহনা, গ্রামের জমি সবই শেষ হতে থাকে। এমন দিন গেছে একবেলা করে রুটি খেয়ে দিনের পর দিন গেছে তাদের। শীতকালে লেপ-কাঁথা বিহীন রাত কেটেছে তাদের। কেউ খাবার কথা জিজ্ঞেস করলে অভিনয় করে বলতেন খেয়েছেন। তবু নিজেদের দীনতার কথা বলতেন না কারো কাছে। ভালো বিয়ের প্রস্তাব আসার পরও দিদির বিয়ে হয় নি শুধু যৌতুক দিতে না পারার কারণে।

১৯৮৫ সালে টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে দিপীকার। নিজের কানের প্রিয় দুল বন্ধক রেখে ফরম পুরণের টাকা সংগ্রহ করতে হয়েছে তাকে। ১৯৮৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে দিপীকা। এ সময় দিপীকার বড় দাদা একটি দোকানের হিসাব রক্ষক হিসেবে চাকুরি পান। পাশাপাশি চা-পাতার ব্যবসা শুরু করেন তিনি, আর দিপিকা শুরু করেন টিউশনি। দুই ভাই বোনের সম্মিলিত আয়ে সংসারে সুদিন আসতে শুরু করে। দিপীকা ভর্তি হন মহিলা কলেজে। এসময় দিপীকার রুটিন ছিলো এ রকম: রেওয়াজ, কলেজের পড়া, সকাল ৭টা থেকে ৯টা, কলেজ ১০টা থেকে ৩টা, টিউশনি, ৪টা থেকে ৭টা এবং রাতের পড়া ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত।

পড়াশোনার পাশাপাশি এ সময়ে ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন দিপীকা। বড় দাদার যুব ইউনিয়ন করার কারণে তিনি ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেন। পরের বছরে জেলা কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। সে বছরই জেলা উদীচীর সাংস্কৃতিক সম্পাদক নির্বাচিত হন তিনি। পড়াশোনার পাশাপাশি সাংগঠনিক এই কার্যক্রম চালিয়ে গেলেও কোন সময় রুটিনের অনিয়ম করেন নি দিপীকা। ১৯৮৮ সালে এইচএসসি পাশ করার করার পর তার টিউশনির পসার বাড়তে থাকে। অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বাসায় ব্যাচ তৈরি করে পড়াতে হতো। ভালো শিক্ষক, ভালো সংগঠক, ভালো শিল্পী হওয়ার কারণে গোটা জেলায় বিশেষ ভাবে পরিচিত হয়ে উঠেন তিনি। এ বছরের ডিসেম্বর মাসে জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন দিপীকা। অনেকের মত দিপীকা জেলার প্রথম মহিলা সদস্য হয়েছিলেন। এ সময় নিজ এলাকা অর্থাৎ চরশোলাকিয়াতে নিজ উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ভাষা শহীদ দিবস পালন করা শুরু করেন তিনি।

১৯৮৯ সালে পিছিয়ে পড়া নারীদের নিয়ে 'চরশোলাকিয়া মহিলা কল্যাণ সমবায় সমিতি' গঠন করেন তিনি। সমিতির রেজি: নম্বর ০৯। এ সমিতি থেকে অনেক নারীকে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ করিয়ে আনেন ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা থেকে। ১৯৯০ সালে হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন দিপীকা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে ফেসিয়াল প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে পনের দিন বিছানায় পড়ে থাকেন তিনি। "এই সময়ে আমি আমার সকল অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করেছিলাম জীবনটা বড় বৈচিত্র্যময়, এখানে সহজে ভেঙ্গে পড়া মানুষগুলো টিকে থাকতে পারে না। আর বেঁচে থাকার আনন্দ অনেকের সাথে ভাগ করে নেওয়া যায়।" অসুস্থ থাকাকালীন এটিই ছিল তার অনুভূতি। দীর্ঘ ১৫ মাস চিকিৎসা গ্রহণের ফলে সুস্থ হয়ে উঠেন দিপীকা।

সুস্থ হওয়ার পর ১৯৯২ সালে কিশোরগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন দিপীকা। এভাবে ভালো-মন্দ মিলিয়ে কাটতে থাকে সময়। ১৯৯৫ সালে 'ডেলটা লাইফ' এর গ্রামীণ বীমা প্রকল্পের কিশোরগঞ্জ থানা ইনচার্জ হিসেবে যোগদান করেন তিনি। এই প্রতিষ্ঠানে কাজ শুরু করার পর ১৫ জনের চাকুরি প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর তিন মাস চাকুরি করার পর এই প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায় নিয়ে ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে 'বিলাস' নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জেলা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এখন পর্যন্ত কর্মরত আছেন।

কাজ পাগল এই মানুষটির সাথে ২০০৫ সালে করিমগঞ্জের চন্দ্রা সরকারের কাছ থেকে স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠন 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ' এবং কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম এর কাজের কথা জানতে পারেন। চন্দ্রা সরকারের আমন্ত্রণে ২০০৫ সালের ১২ আগস্ট করিমগঞ্জ উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে দিনব্যাপি কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন। একই বছর নভেম্বর মাসে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হন। এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে বছরব্যাপি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেকে শাণিত করেছেন। এরমধ্যে ২০০৬ সালের ১৯ থেকে ২২ মে ৯৫৪তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ২০০৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম-কিশোরগঞ্জ জেলার সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া দিপীকা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে দায়িত্ব পালন করছেন।

এসকল কাজ করার মাধ্যমে দিপীকার তার বঞ্চনার অতীত ইতিহাস ভুলে যেতে চান। তৈরি করতে চান নারীদের জন্য নিরাপদ রাষ্ট্র। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলের নারীদের সাথে ইতোমধ্যে ১৩টি উঠান বৈঠক, ৩টি আলোচনা সভা, ৪টি ইস্যুভিত্তিক কর্মশালা, বিভিন্ন ইস্যুতে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছেন। দিপীকা বিশ্বাস করেন, নারীর প্রতি চলমান সহিংসতা দূর করতে হলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। তাই এই সংস্কার আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য নিজ জেলায় 'সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন' তৈরি করেছেন। জেলা 'সুজনে'র উদ্দ্যোগে ২টি মতবিনিময় সভা, মানববন্ধন সহ বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কাজ করে যাচ্ছেন। তার আয়োজিত এই কার্যক্রমে দুই হাজারের ও বেশি মানুষ বিভিন্ন সময়ে সম্পৃক্ত হয়েছে।

সাদামাটা জীবন যাপনকারী এই মানুষটি প্রথমে নিজের পরিবার এবং বর্তমানে মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করছেন। সবার সংসার টিকিয়ে রাখার আন্দোলনে ব্যস্ত থাকার কারণে নিজেরই সংসার করা হয় নি তার। একা থাকবেন? প্রশ্ন করতেই উত্তর মেলে একা কোথায়, সকল জেলার সুবিধা বঞ্চিত মানুষ আর নির্যাতিত নারীদের নিয়ে আমার জীবন সংসার। এদের নিয়েই কাটাতে চাই বাকী জীবন।

দিপীকার সব থেকে বড়গুণ হলো, যে সংগঠনের যে দায়িত্ব পালন করেন না কেন খুব যত্নের সাথে তা করেন। ফলে যে পদে থাকেন নেতৃত্ব তার হাতেই থাকে। আজ এই অবস্থানে থেকে একটি স্বপ্ন লালন করে চলেছেন দিপীকা। নিজে কষ্ট আর চোখের পানিতে টিকে থাকার যে রাস্তা তৈরি করেছেন সেই কষ্ট ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে করতে দেবেন না। এই কারণেই নারীদের জন্য তৈরি করতে চান গানের স্কুল, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নারীদের আয়মুখী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার জন্য সেলাই শিক্ষা কেন্দ্র। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য কাজও শুরু করেছেন দিপীকা।

দিপীকার স্বপ্ন পূরণ হোক। একজন শহীদ পিতার স্বপ্ন পূরণের জন্য দিপীকার জয় হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন বৃথা হয়ে যাবে। এমনিতে অনেক ব্যর্থতার দায় আছে আমাদের কাঁধে। নতুন করে আর কোন দায় নিতে চাই না। তাই আসুন দিপীকার দিন বদলের স্বপ্নসাথী হয়ে আমরা আমাদের সফলতার রাস্তা তৈরি করি।

ইরার প্রচেষ্টায় আলোকিত হতে চলেছে রংপুরের হরিজন সম্প্রদায়

মাজেদুল ইসলাম

রংপুর শহরের নিউ জুম্মাপাড়ার হরিজন সম্প্রদায়ের কাছে ইরা দ্বিতীয় ঈশ্বর। অবহেলিত হরিজন সম্প্রদায় নতুনভাবে বাঁচতে শিখেছে, পরিবর্তিত হয়েছে তাদের জীবন মান। তাদের ছেলে মেয়েরা-পড়ালেখা করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ও অবদান রাখার স্বপ্ন দেখছে। এই সম্ভাবনার দ্বার যিনি খুলে দিয়েছেন তিনি হলেন রংপুরের শালবন এলাকার বাসিন্দা ফাতেমা ইয়াসমিন ইরা। সকলের কাছে ইরা হক নামে পরিচিত। তবে নামে নয়, তিনি তাঁর কর্মের মাধ্যমে সকলের কাছে প্রশংসিত এবং অনুকরণীয়।

গাইবান্ধা জেলার পশ্চিমপাড়া এলাকায় ১৯৫৭ সালের ১৭ অক্টোবর ইরা হকের জন্ম। বাবা একরামুল হক পারচেজার অফিসার, মা রিজিয়া হক গৃহিণী। সংস্কৃতিমনা পরিবার ছিল ইরা হকের। দুই বোন, তিন ভাইয়ের সংসারে আদরের কোন ঘাটতি ছিল না। ছোটবেলা থেকে পরিবারের স্নেহ-যত্নে একটি স্বাধীনচেতা মন নিয়ে বেড়ে ওঠেন দূরন্ত প্রকৃতির ইরা হক। নাচ, গান, খেলাধুলা, সাইকেল চালানো ছিল ইরার শখ। স্কুলে বন্ধুত্ব হত সবচেয়ে দরিদ্র মেয়েদের সাথে। বন্ধন হত ভালবাসার। ইরা হক ১৯৭৪ সালে রংপুর লালকুঠি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং ১৯৭৬ সালে বেগম রোকেয়া কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। ১৯৭৭ সালে পরিবারের অমতে ভালবেসে বিয়ে করেন। স্বামী রেজাউল হক রেজা বর্তমানে রংপুরের একজন প্রথিতযশা আইনজীবী। বিয়ের কারণে বাবার সাথে দূরত্ব তৈরি হলেও এক বছরের মধ্যে তার স্বামী, শ্বশুরের সহযোগিতায় দূরত্ব কমিয়ে আনে। ইরা হকের তিন ছেলে। বড় ছেলে ওয়াহিদ রেজা বাপ্পী সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, মেজো ছেলে জাহিদ বিন রেজা জনি ম্যানেজমেন্ট এবং ছোট ছেলে আবিদ বিন রেজা অনি কম্পিউটার বিজ্ঞানে লেখাপড়া করছে।

স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করলেও ইরা হক সব সময় চিন্তা করতেন সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের নিয়ে। ১৯৯৩ সালের ঘটনা। রংপুর পৌরসভার কমিশনার হবার প্রস্তাব আসে ইরা হকের কাছে। প্রথম দিকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির কারণে চিন্তিত হলেও পরবর্তীতে এটিকে তাঁর স্বপ্ন পূরণের সুযোগ হিসেবে চিন্তা করে স্বামীর সম্মতি নিয়ে রাজি হয়ে যান। কমিশনার হবার পর পৌরসভার রুটিন কাজ ইরা হকের চিত্তকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। তিনি বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখছিলেন।

১৯৯৪ সালের ঘটনা। পৌরসভার পাশেই হরিজন সম্প্রদায়ের বসবাস। হরিজন সম্প্রদায়ের অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপন ইরা হককে চিন্তিত করে তোলে। তিনি মনে করলেন যদি এদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা যায় তাহলে এদের জীবন মানের পরিবর্তন আনা সম্ভব। সম্পূর্ণ একক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করলেন পৌর হরিজন প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রথমে ১২ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে পৌরসভা ভবনের পেছনের বারান্দায় পড়ানো শুরু করেন ইরা হক। পরবর্তীতে শিশুদের সংখ্যা বেড়ে

যাওয়ায় পৌরসভার পেছনের গ্যারেজে স্কুলটি স্থানান্তরিত করেন। গ্যারেজে স্থান পাওয়া এবং স্কুলটি এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তৎকালীন পৌর চেয়ারম্যান শরফুদ্দীন আহম্মেদ ঝন্টু সহযোগিতা করেন। স্কুলের শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেন। শিক্ষকদের বেতন পৌরসভা থেকে দেবার ব্যবস্থা করেন ইরা হক।

১৯৯৬ সালে স্কুলে বাচ্চাদের সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। স্থান সংকুলান না হওয়ায় নিউ জুম্মাপাড়ার সুইপার কলোনিতে স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়। পৌরসভার জায়গাতে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ইরা হকের উদ্যোগে। স্কুলটিকে কেন্দ্র করে এবং ইরা হকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় হরিজন সম্প্রদায়ের জীবন মানের পরিবর্তন হতে থাকে। তিনি সুইপার কলোনিতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন বিষয়ে প্রচারাভিযান পরিচালনা করেন। বর্তমানে হরিজন সম্পদায়ের ৯৫% পরিবারের ছেলে-মেয়েরা এই স্কুলে লেখাপড়া করছে। সুইপার কলোনিতে শতভাগ স্যানিটেশন হয়েছে। সবাই নিরাপদ পানি পান করে। যদিও পানি সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। স্কুলের পড়ালেখার মানের কারণে সাধারণ পরিবারের ছেলে মেয়েরাও এখানে একত্রে পড়ালেখা করছে। এটি সমগ্র বাংলাদেশের জন্য একটি দৃষ্টান্ত। আর এ দৃষ্টান্তের কারিগর ইরা হক।

১৯৯৮ সাল। মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধের কারণে দ্বিতীয় বারের মত পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত হন ইরা হক। স্কুলটিকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছিল ইরা হকের জীবন। এরই মাঝে ২০০৫ সালে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ' পরিচালিত রংপুর রোটারী সেন্টারে অনুষ্ঠিত ৭৬৮তম ব্যাচের উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন ইরা হক। এ প্রশিক্ষণ ইরা হকের চিন্তা চেতনায় নতুন গতির সঞ্চার করে। তিনি রংপুর শহরের আরো নারীদের সম্পৃক্ত করে বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রতিরোধে কাজ করে চলেছেন। স্বামীকে তাঁর কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে নির্যাতিত নারীদের আইনি সহায়তা দিচ্ছেন। তিনি কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম রংপুর জেলার সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। এসব কাজে তাঁর স্বামী যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। তাঁর স্বামীর অনুভূতি এরকম- "তৃণমূল মানুষদের প্রতি তার ভালবাসা দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি তাকে এ কাজে উৎসাহিত করি "।

ইরা হক ২০০৬ সালে রাজশাহীতে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ' পরিচালিত দ্বিতীয় ব্যাচের নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এ প্রশিক্ষণ তার নারীদের উন্নয়ন ধারণাকে আরও বেশি সংহত করে। ইরা হকের এখন দু'টি স্বপ্ন। এক. তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলের পাকা ভবন হবে; দুই. তিনি পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান হবেন। এ দু'টি স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন ইরা হক। সমাজে বিদ্যমান দীর্ঘদিনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর কাজে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন অনেক নারী। ইরা হক তাদেরই একজন। পূরণ হোক ইরা হকের স্বপ্ন। জয়তু ইরা হক।

রাজিয়া সরকারের এগিয়ে চলা

মাজেদুল ইসলাম

চড়াই উৎরাইয়ের এক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে জীবনের গতিকে ত্বরান্বিত করতে হয়। সময়ের স্রোতের সাথে জীবনের স্রোত প্রবাহিত হয়। আর এরই মধ্যে অমানিশার ঘোর অন্ধকার যেমন জীবনকে আচ্ছন্ন করে, তেমনি পূর্ণিমার আলো ঝলমল আভা জীবনকে উল্লসিত, উদ্বেলিত করে। এই উপক্রমনিকা যার উদ্দেশ্যে তিনি হলেন দিনাজপুর জেলার শেখপুরা ইউনিয়নের রাজিয়া সরকার। সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার দেলুয়াবাড়ী গ্রামে রাজিয়া সরকারের জন্ম। বাবা রইসউদ্দিন আহম্মেদ ব্যবসায়ী, মা জগতি বেগম গৃহিণী। বর্তমানে তিন ছেলের জননী রাজিয়া সরকারের বয়স আনুমানিক ৬৫ বছর।

রাজিয়া সরকারের বয়স যখন তিন বছর তখন তাঁর মা মারা যান। বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করতে খুব বেশি দেরি করেন নি। একরকম অনাদর আর অবহেলায় শৈশব কেটেছে রাজিয়ার। ব্যবসায়িক সূত্রে রাজিয়ার বাবা স্থায়ী আবাস গড়ে তোলেন রাজশাহীতে। কিন্তু কোন স্থায়ী আবাস রাজিয়ার ছিল না। কখনও নানার বাড়ি শেরপুর, কখনও চাচার বাড়ি সিরাজগঞ্জ, আবার কখনওবা বাবার বাড়ি রাজশাহী। ফলে লেখাপড়ায় ধারাবাহিকতা ছিল না। দিনাজপুরের শেখপুরার বাড়িতে কথা হচ্ছিল রাজিয়া সরকারের সাথে। স্মৃতি হাতড়ে দুঃখভরা মন নিয়ে বললেন, আমার প্রতি কারও কোন নজর ছিল না। আমি কোনোদিন সকালে পড়তে বসতে পারি নি, গরম ভাত খাই নি। বাবার দ্বিতীয় বিয়ের পর দুই ভাইয়ের জন্ম হয়, তাদের দেখাশুনা করতেই আমার বেশি সময় ব্যয় হত। আরেকটু স্মৃতি হাতড়ে বেশ উচ্ছস্বিত কণ্ঠে বললেন, রাজশাহী পিএন গার্লস স্কুলের ছাত্রী ছিলাম। স্কুলে নাটক, আবৃত্তি করতাম। চুরি করে পদ্মায় সাঁতার কাটতে যেতাম, স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে মিছিলে যোগ দিতাম।

এমনি চলছিল রাজিয়া সরকারের জীবন। হঠাৎ ১৯৬০ সালের ২৭ নভেম্বর অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই দূরন্ত ও মেধাবী মেয়েটির বিয়ে হয় দিনাজপুরের এক আত্মীয়ের সাথে। স্বামী মতিয়ার রহমান তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ১৯৬১ সালে স্বামীর পড়ালেখা শেষ হয়। রাজিয়া সরকার স্বামীর সাথে দিনাজপুরে চলে আসেন। প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে ভর্তি হন দিনাজপুর সারদেশ্বরী স্কুলে। কিন্তু সাংসারিক কাজের চাপ এবং চাচা শ্বশুর, ননদদের অসহযোগিতার কারণে পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায় রাজিয়া সরকারের। ইতোমধ্যে স্বামী দিনাজপুর থেকে গাইবান্ধা চলে যান চাকুরির প্রয়োজনে। শুরু হয় চরম একাকীত্বের জীবন। স্বামী মাঝে মাঝে দিনাজপুরে আসতেন।

১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে বড় ছেলে তোতন এবং ১৯৬৭ সালে মেজো ছেলে রূপম জন্ম নেয়। "স্বামীর সাথে পরামর্শ করে ১৯৬৭ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিলাম, কিন্তু প্রস্তুতির অভাবে কৃতকার্য হতে পারলাম না" বললেন রাজিয়া সরকার। এ সময়কালে রাজিয়া সরকার দেশ মাতৃকার স্বাধীকার আর স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। এই যুক্ত হওয়ার কথাই শুনব রাজিয়া সরকারের মুখে, "আমার অসুস্থতার সূত্র ধরে পরিচয় হয় স্বামীর বন্ধু ডা. সমর এর সাথে। সমরদার বাবা বড় দাদা ভূষণ চক্রবর্তী ছিলেন রাজনীতি সচেতন মানুষ। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমি ৬৯ সালে ড. শামসুজ্জোহা শহীদ হওয়ার পর দিনাজপুরে নারীদের সংগঠিত করে মিছিল করেছি। ৬ দফা, ১১ দফার আন্দোলন করেছি। হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি। এরপর শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। স্বামী সন্তান নিয়ে চলে যাই ভারতে। কিন্তু প্রতিনিয়তই এক ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করতাম। স্বামীকে বললাম, চল দেশে ফিরে যাই। স্বামী বুঝল। অনেক কষ্ট করে ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে ফিরে আসলাম স্বামীর কর্মস্থল গাইবান্ধায়। এরপর মুক্তিযুদ্ধকালীন পুরো সময়ই মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাকবাহিনীর বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করেছি। অবশেষে দেশ স্বাধীন হল।"

১৯৭২ সালে রাজিয়া সরকার দিনাজপুর ফিরে আসেন। অন্যদিকে তাঁর স্বামী থেকে যান গাইবান্ধাতেই। ইতোমধ্যে রাজিয়া সরকার এসএসসি পাশ করেন। ১৯৭৩ সালে স্বামী দিনাজপুর কেবিএম কলেজে যোগদান করেন। ৭৪ সালে ছোট ছেলে সুমনের জন্ম হয়। সাংসারিক কাজ বেড়ে যাওয়ায় কলেজে ভর্তি হতে পারলেন না। কিন্তু দেশ গড়ার উদ্দীপনা যার রক্তে মিশে আছে তাকে কি গৃহকোণে মানায়? রাজিয়ার সামাজিক কাজে সম্পৃক্ত হবার ক্ষেত্রে সুবিধা হল। ১৯৭৬ সালে বাড়ির পাশে ৫০ জন ছেলে-মেয়ে নিয়ে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। একজন শিক্ষক নিয়োগ করেন। বিভিন্নভাবে টাকা সংগ্রহ করে রাজিয়া সরকার নিজেই স্কুলের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতেন।

১৯৭৮ সালে দিনাজপুরে 'নারী মুক্তি সংসদ' প্রতিষ্ঠা করে সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৮৪ সালে 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদে'র সাথে যুক্ত হন। ছোট বেলার চিকিৎসক হবার স্বপ্ন পূরণ করেছেন রাজিয়া। ১৯৮৫ সালে হোমিও কলেজ থেকে ডিপ্লোমা ইন হোমিও মেডিসিন কোর্স সম্পন্ন করেন। সামাজিক কাজের পাশাপাশি রাজিয়া সরকার ১০ বছর যাবৎ চিকিৎসা পেশার সাথে জড়িত। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবং অদ্যাবধি সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে চলেছেন। ১৯৯৬ সালে দেশের একটি প্রথম সারির রাজনৈতিক দলের দিনাজপুর জেলা শাখার মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা ছিলেন, বর্তমানে সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। ২০০৪ সালে তিনি উক্ত দলটির দিনাজপুর জেলা শাখার উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং অদ্যাবধি সেই দায়িত্ব পালন করছেন।

মাঝে মাঝে হতাশ হন রাজিয়া সরকার, আবার দৃঢ় মনোবলে উদ্যোগী হন। এমনি এক সময়ে শেখপুরা ইউনিয়নে আয়োজন চলে একটি প্রশিক্ষণের। রাজিয়া সরকার শুনে অবাক হন যে, এই প্রশিক্ষণ বৃত্তিমূলক নয়, নেই কোন আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের সুপ্ত শক্তির জাগরণ ঘটানো হয়। তিনি জীবনে অনেক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, কিন্তু এরকম একটি প্রশিক্ষণের অভাব বার বার অনুভব করেছেন। সুতরাং ২০০৬ সালে বিপুল উৎসাহে তিনি অংশগ্রহণ করেন 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ' পরিচালিত ৮২২তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে। প্রশিক্ষণের সঙ্গে পাল্টে যান রাজিয়া সরকার, বদলে যায় তার কর্মকাণ্ডের ধরন, পরিবর্তিত হয় কৌশল। ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ' পরিচালিত নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ দু'টির মাধ্যমে রাজিয়া সরকার সামাজিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে নারীদের উন্নয়নে অধিক মনোযোগী হয়ে ওঠেন। ২০০৬ সালে রাজিয়া সরকার 'জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম' দিনাজপুর জেলা শাখার সভাপতি মনোনীত হন। তিনি নারীদের অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তনে নিবিড় মনে কাজ করে চলেছেন। তিনি এখন স্বপ্ন দেখেন নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য হওয়ার, যাতে করে নারীদের উন্নয়নে আরো বড় ভূমিকা রাখতে পারেন। পূরণ হোক রাজিয়া সরকারের স্বপ্ন, গড়ে উঠুক সমতার সুন্দর বাংলাদেশ।

শোষণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠঃ নাহিদ সুলতানা

তানিয়া রহমান

"যখনই সুযোগ পেয়েছি, দরিদ্র মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। অনেক সময় এমনও হয়েছে আমার দরকার ২০ টাকা, বাবার কাছ থেকে নিয়েছি ৫০ টাকা। আর পুরো টাকাটাই অন্যকে দিয়ে দিতাম। প্রায় সময়ই দেখা যেত আমি বাসা থেকে চাল, টাকা, কাপড় দরিদ্র মানুষদের দিয়ে দিতাম। বাসার কেউ অবশ্য কিছু বলতো না। সবাই জানতো আমি গরীব, দুঃখীদের এগুলো দিচ্ছি। আর আমার ছোটবেলা থেকেই কেন জানি না নারীদের প্রতি এক বিশেষ অনুভূতি কাজ করতো। সব সময় মনে হতো দেশের উন্নয়ন তখনই সম্ভব হবে যখন দেশের অধিকাংশ নারীরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। হতে পারবে স্বাবলম্বী। হয়তো এ ধরনের অনুভূতি হতে পারে আমি নিজে নারী বলে। তবে এ কথাও সত্যি যে, আমাদের সমাজের নারীরা গ্রাম বা শহর, যে জায়গাতেই তার বসবাস হোক না কেন তারা নানাভাবে বৈষম্য এবং নির্যাতনের শিকার হয়। তাই তো কোন নারী নির্যাতনের কথা শুনলেই আমি সব কিছু ভুলে যাই। ছুটে যাই তার পাশে দাঁড়াবার জন্য। কারণ, আমাদের এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যে সকল নারীরা প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হয়, তাদের ন্যায্য অধিকার সমাজে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করাই আমার কাজ"- কথাগুলো বললেন সংগ্রামী এক নারী। সভ্যতার দ্বার প্রান্তে এসে আজও যেখানে নারীদের অস্বিত্ব মুছে যাবার পথে। ঠিক সে সময়েই এক স্বোচ্চার কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যায় বাংলাদেশের এক প্রত্যন্তগ্রাম থেকে। আর পুরুষদের শোষণের বিরুদ্ধে স্বোচ্চার সে কণ্ঠ গাজীপুরের নাহিদ সুলতানার।

পিছনে ফেরা

ছোটবেলা থেকেই প্রচণ্ড দূরন্ত প্রকৃতির ছিলেন নাহিদ। প্রকৃতির উচ্ছাস যেন তার স্বভাবের সাথে মিশে থাকতো। দূরন্ত আর দুষ্ট ছিলেন সত্যিই, তবে কারও ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ কখনও করতেন না। বাড়ির সবাই বিরক্ত না হয়ে বরং তাকে আদর করতো সবচেয়ে বেশি। কারণ দুষ্ট হলেও লেখাপড়ায় বেশ ভালো ছিলেন। সারাদিন পুরো গ্রাম ঘুরে বেড়াতেন আর সন্ধ্যা হলেই পড়তে বসে যেতেন। ছোটবেলা থেকেই তার স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে এমন কিছু করবেন, যার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের উপকার হবে। তাই তাকে এমনভাবে গড়ে উঠতে হবে যাতে তিনি এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। পাড়ি দিতে পারবেন বহুদূরের পথ।

সংগ্রামী এই নারী ১৯৬৪ সালে গাজীপুরে কালীগঞ্জের সোনাবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভাই বোনদের মধ্যে নাহিদের অবস্থান ছিলো দ্বিতীয়। প্রচণ্ড চটপটে এবং দূরন্ত স্বভাবের হওয়ায় বাড়ির সবাই নাহিদের কথার বেশ প্রাধান্য দিত। তার সব আবদারই পূরণ করা হতো। সে আদুরে স্বভাবের নাহিদের মধ্যে জন্ম নেয় অন্যকে সাহায্য করার মানসিকতা। তিনি দেখলেন, তার চারপাশের অনেক মানুষ আছে যাদের একবেলা খাবার জুটতো না, টাকার অভাবে চিকিৎসা হয় না। তাদের

এ দুরবস্থা দেখে নাহিদের ছোট মন কেঁদে উঠতো। তাই যখনই সুযোগ পেতেন অন্যের পাশে এসে দাঁড়াতেন। তার এ কাজে বাড়ির কেউ কখনো আপত্তি করে নি, বরং উৎসাহ দিতো। এরই মাঝে সময় গড়িয়ে যায়। নাহিদও আর ছোটটি থাকেন না। হয়ে উঠেন কিশোরী। 'কালীগঞ্জ গার্লস হাইস্কুল' থেকে এসএসসি পাশ করে শেষ করেন স্কুলের গণ্ডি। ভর্তি হন 'কালীগঞ্জ শ্রমিক কলেজ' এ। লেখাপড়ায় ভালো থাকা নাহিদ বেশি দূর লেখাপড়া চালাতে পারেন নি। বিয়ে হয়ে যায় ওবায়দুল হক সরকার নামের ডিজেল-মবিল ও রাইস মিলের এক ব্যবসায়ির সাথে। তবে বিয়ের পরের বছর এইচএসসি পাশ করেন।

বিয়ে হয়ে যাবার পর নাহিদ শ্বশুরবাড়ি নরসিংদীতে চলে আসেন। শুরু হয় নতুন জীবন। বাড়ির বড় বউ হবার কারণে পরিবারের সব দায়িত্ব এসে পড়ে তার কাঁধে। তাই বলে কোন ভারী বা ঝামেলার কাজ করতে হতো না তাকে। সাহায্য করার জন্য পর্যাপ্ত লোকজন বাড়িতে ছিল। তবু বড় বউ হিসেবে যতটুকু দায়িত্ব পালন না করলেই নয় ততটুকুই করতেন তিনি। শ্বশুরবাড়ির লোকজন কেমন হবে এ নিয়ে বিয়ের আগে দ্বিধায় ভুগছিলেন। কিন্তু সে দ্বিধা ভেঙ্গে যায় যখন দেখেন তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা সবাই বেশ উদার মানসিকতার। সময়ের সাথে সাথে নাহিদও জড়িয়ে পড়েন সংসারের ব্যস্ততায়। এরমধ্যে এক ছেলে সন্তানের মা হন। সংসারের সাথে যেন আরো আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু তারপরও মনে সব সময় উঁকি দেয় পাশের বাড়ির অভাবী কোন মানুষের কথা। পরোপকারি মনোভাব যে ছাড়তে পারেন নি তিনি। তাই সুযোগ পেলেই অন্যকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়াতেন। এ ধরনের কাজে নাহিদ তার স্বামীকে বন্ধুর মত সব সময় পাশে পেয়েছেন। স্বামীর উৎসাহ ও সমর্থনে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রতি আরো আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

নাহিদের এক সময় মনে হতে থাকে, শুধু পাশের বাড়িরই নয় বরং এলাকার সকল সুবিধাবঞ্চিত নারীদের সাহায্য করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থাকা। এমন কোন প্রতিষ্ঠান যারা সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারীদেরকে নিয়ে কাজ করে থাকে। এই চিন্তা থেকেই কাজ করা শুরু করেন মহিলা অধিদপ্তরের অধীনস্থ 'দুর্বার নেটওয়ার্ক'-এ। এ সংস্থার মাধ্যমে শুরু হয় নতুন করে নাহিদের পথ চলা। নতুন নতুন কাজ শেখা, গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়ানো, সমাজের বঞ্চিত নারীদের সাহায্য করার মধ্য দিয়ে নাহিদ যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেন। এগিয়ে চলেন আগামীর পথে। এর মধ্যে একদিন দুর্বার নেটওয়ার্কের রাশিদা আপা তাকে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশে'র উজ্জীবক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জানান। প্রশিক্ষণের ধরণ, বিষয়বস্তু সম্পর্কে জেনে তার মধ্যে প্রবল আগ্রহ গড়ে উঠে প্রশিক্ষণটি গ্রহণ করার। তার মনে হয় এই প্রশিক্ষণ তার কাজকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। তাকে আরো সাহসী করে তুলবে। তাই কোন দিক বিবেচনা না করে ৩৬৫তম ব্যাচের উজ্জীবক প্রশিক্ষণটি গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের 'নারীর ক্ষমতায়ন' সেশনটি নাহিদের আত্মবিশ্বাসকে যেন আরো বাড়িয়ে দেয়। তিনি হয়ে উঠেন আরো সাহসী ।

অন্ধকার নেমে আসে জীবনে

১৯৯৯ সাল। অন্য সময়ের মত স্বাভাবিকভাবেই চলছিল জীবন। কিন্তু জীবন যেন তার আসল রূপ দেখালো। দাঁড় করালো এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি। যে বাস্তবতা কারো জীবনেই কাম্য নয়। নাহিদ চিরতরের জন্য হারালেন তার সবচেয়ে কাছের বন্ধুকে। হারালেন তার স্বামীকে। হয়ে গেলেন একদম একা, নিঃসঙ্গ। জীবনের এই কঠিন সময়ের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়লেন। থেমে গেল তার সকল কর্মস্পৃহা। নিজেকে সরিয়ে নিলেন সকল কর্মকাণ্ড থেকে। কিন্তু জীবনতো আর থেমে থাকে না। যতোই দুঃখ-কষ্ট আসুক জীবন তার আপন গতিতে চলে। আর সে চলার গতিতে নাহিদও এক সময় জড়িয়ে পড়েন। ব্যস্ত হয়ে পড়েন যান্ত্রিক জীবনের ধারাবাহিকতায়।

ফিরে আসেন পুরানো ধারায়

সুযোগ পেলেই আবারও দরিদ্র্য বিত্তহীন মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবেন এ রকমটা ছিল তার সুপ্ত বাসনা। কিন্তু সংসারের দায়িত্ব থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিতে পারছিলেন না। এ সময় তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে তার পুরো পরিবার।

বন্ধুর মতোই নাহিদের পাশে এসে দাঁড়ায়। পরিবারের সবাই নাহিদকে সাহস যোগায় কষ্টের বেড়াজাল ভেঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। পরিবারের সদস্যরা তাকে সহযোগিতা করে নতুন করে আবারো জীবন শুরু করতে। পরিবারের উৎসাহ ও সাহসে নাহিদ আবারো তার সামাজিক কর্মকাণ্ডে ফিরে আসেন। মনের দুর্বলতাকে শক্তি বানিয়ে নেমে পড়েন কাজে। নতুন উদ্যমে, নতুন সাহসে।

নতুন উদ্যমে, নতুন সাহসে

নাহিদ যখন তার কর্মকাণ্ডে পুনরায় ফিরে আসেন তখন যেন এক নতুন নাহিদের জন্ম হয়। এ নাহিদ যেন আরো শক্তিশালী, আরো সাহসী, আরো পরিশ্রমী। তাকে আর কোন কিছুই আটকাতে পারবে না। তবে যে কোন কাজের জন্যই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেলেই কাজের স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু কিভাবে শুরু করবেন তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তাকে অনেকেই একটি সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা শুরু করতে বলেন। তখন তিনি 'বন্ধন সমাজকল্যাণ সংস্থা' নামে এক সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার জন্য মহিলা অধিদপ্তরে আবেদন করেন। তারা সংস্থাটির ছাড়পত্র দেন ১৯৯৯ সালে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে কোন কাজ শুরু করা সম্ভব হয় নি। এ সময় তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন ইউপি মেম্বার শাহ আলম ভূঁইয়া। তিনি 'বাদুয়ারচর শতদল সমাজকল্যাণ সংস্থা' নামের একটি সামাজিক উন্নয়নমূলক সংস্থা পরিচালনা করতেন। যার সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০ জন। এই সংস্থায় মৎস্য চাষ, সেলাই প্রশিক্ষণের মত বেশ কিছু কাজ আগে করা হয়েছিল। কিন্তু সে সংস্থাটির কার্যক্রম জনগণের কাছে তেমনভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এক পর্যায়ে সংস্থাটি বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। শাহ আলম মনে মনে তাই এমন একজনকে খুঁজছিলেন যিনি তার এই সংস্থার হাল ধরতে সক্ষম হবেন। তখনই তার মনে আসে নাহিদের কথা। তার সাথে কাজ করার জন্য নাহিদকে প্রস্তাব দেন। নাহিদও সানন্দে রাজী হয়ে যান এবং ২০০০ সালে সংস্থার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর নাহিদের কাজের পরিধি যেন আরো বেড়ে যায়। সবসময় চাইতেন সমাজে দরিদ্র ও বিত্তহীন নারীদের উন্নয়নে কাজ করবেন। কাজ করবেন নির্যাতিত নারীদের অধিকার আদায়ের জন্য। রুখে দাঁড়াবেন পুরুষদের শোষণের বিরুদ্ধে। শুধু রুখে দাঁড়ালেই হবে না, নির্যাতিত নারীদেরকে অর্থনৈতিক দিক দিয়েও স্বাবলম্বী করতে হবে। আর সে চিন্তা থেকেই তিনি এলাকার দরিদ্র নারীদের বিভিন্ন ধরনের সেলাই এবং হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করেন। এছাড়াও নাহিদ দরিদ্র্য নারীদের বিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋণ নেবার ব্যবস্থা, তাদের হস্তশিল্প বিভিন্ন স্থানে বিক্রিরও ব্যবস্থা করে দিতেন। এভাবে দুই বছর কাজ করার পর ২০০২ সালে সংস্থার তৎকালীন সভাপতি পদত্যাগ করেন এবং সংস্থাটি রেজিস্ট্রেশন করে নাহিদের নামে দিয়ে দেন। এরপর থেকেই নাহিদ সংস্থার সভাপতি এবং নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

নারীদের প্রতিনিধি নাহিদ সুলতানা

বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশে প্রতিনিয়ত নারী নির্যাতন যেন আজ এক স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। 'পুরুষরা নারীদের নির্যাতন করবে আর নারীরা তা মুখ বুজে সহ্য করবে' এটাই যেন আজকের ছবি। কিন্তু এই ছবি চিরতরে মুছে ফেলতে হবে। মুছে ফেলতে হবে অত্যাচারের সেতুবন্ধন। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এখনই রুখে দাঁড়াতে হবে। নয়তো অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে তার সীমানা। তাই কোথাও নারী নির্যাতনের ঘটনা শুনলেই নাহিদ যেন পরিবার পরিজন ভুলে যান। ছুটে যান উপকার করার জন্য। বাড়িয়ে দেন তার সাহায্যের হাত। ধীরে ধীরে এলাকার সকলের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা এত বেড়ে যায় যে, এলাকার যে কোন সমস্যা দেখা দিলে প্রথমেই তা জানানো হয় নাহিদকে। কারণ এলাকাবাসী জানে নাহিদ ছাড়া তাদের সমস্যার সমাধান কেউ করতে পারবে না। সমস্যাগুলোর সমাধান প্রক্রিয়া হিসেবে নাহিদ বেছে নিয়েছেন সালিশ প্রক্রিয়াকে। সালিশে ক্ষতিগ্রস্ত এবং দোষী উভয় পক্ষের লোকজনরা উপস্থিত থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে উভয়পক্ষের কথা শুনে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে যদি সালিশের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব না হয় তখন বাদীপক্ষের অনুমতি নিয়ে থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এক্ষেত্রে যে সকল পরিবারের পক্ষে মামলা চালানো সম্ভব হয় না সে পরিবারগুলোকে সংস্থা সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে থাকে। এছাড়া সংস্থায় একটি 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করা হয়েছে। এর সদস্য ৯ জন এবং কমিটির সভাপতির দায়িত্বে আছেন নাহিদ। এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বাদুয়ারচর শতদল সমাজকল্যাণ সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে দুর্বার নেটওয়ার্ক। সমস্যা সমাধানে আইনি প্রক্রিয়াকে ব্যবহারের যুক্তি হিসেবে নাহিদ মনে করেন, আইনি প্রক্রিয়াকে সবাই ভয় পায়। এই প্রক্রিয়ায় কোন ব্যক্তিই জড়াতে চায় না। তাই সবাই প্রথমে পারিবারিকভাবেই তা সমাধানের চেষ্টা করে থাকে। যখন সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয় না তখনই মামলা পর্যন্ত গড়ায়।

হোম ওয়ার্কারদের নিয়ে কাজ

যাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নাহিদের এই সংগ্রাম তাদের যদি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তোলা যায় তবেই প্রকৃত অর্থে নারীর উন্নয়ন সম্ভব হবে। আর্থিক স্বচ্ছলতাই পারে পিছিয়ে পড়া মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। তার সে ভাবনার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য হোম ওয়ার্কারদের নিয়ে কাজ শুরু করেন। মূলত, হোম ওয়ার্কাররা হলেন যারা ঘরে বসে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক যেমন-সেলাই, হস্তশিল্প ইত্যাদি কাজের সাথে জড়িত থাকে। নাহিদ তার সংস্থা থেকে ২০০৪ সালে প্রথম একটি কর্মশালা করেন হোম ওয়ার্কারদের নিয়ে গাজীপুরে। কর্মশালায় হোম ওয়ার্কারদের অধিকার, তাদের মর্যাদা, কর্মপরিধি, সময়জ্ঞান, বেতনভাতা ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দেন। এই হোম ওয়ার্কাররাই 'বন্ধন হেন্ডিক্রাফট্'-এ কাজ করে থাকে।

কাজের পরিধি বেড়ে যাওয়া

জন্মস্থান গাজীপুরে হলেও গাজীপুরের জন্য কোন উন্নয়নমূলক কাজ করেন নি নাহিদ। তাই জন্মস্থান গাজীপুরেও তার কাজগুলো শুরু হোক মনে মনে এটাই চেয়েছিলেন। এই সুযোগ আসে হোম ওয়ার্কারদের নিয়ে কর্মশালা করতে গিয়ে। সে কর্মশালায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা অধিদপ্তরের গাজীপুর শাখার ভারপ্রাপ্ত অফিসার কামরুন নাহার। তিনি নাহিদের বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা শুনে গাজীপুরেও তার কার্যক্রম শুরু করতে বলেন। তিনি যেন নাহিদের মনের কথাটাই বলেন। তার কথায় উৎসাহ পেয়ে ২০০৪ সালে দুটি সংস্থার রেজিস্ট্রেশন করেন। একটি হলো 'বন্ধন হেন্ডিক্রাফ্ট' অন্যটি 'বন্ধন ডেভেলোপমেন্ট সোসাইটি'।

২০০৪ সালের অক্টোবর মাস থেকে 'বন্ধন হেন্ডিক্রাফটে'র কাজ শুরু হয়। এখানে ব্লক-বাটিক, হাতের কাজ, সেলাই ও প্রশিক্ষণের কাজ করা হয়। হেন্ডিক্রাফটে'র তৈরিকৃত পণ্য সামগ্রী বিভিন্ন মেলায় বিক্রির জন্য পাঠানো হয়। তাছাড়া নাহিদ নিজ উদ্যোগে বছরের বিভিন্ন সময়ে মেলারও আয়োজন করে থাকেন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী প্রায় ৫০০ জন। এতে সেলাই প্রশিক্ষক হিসেবে ৩ জন, টেইলার্সে ৫/৭ জন এবং ডিজাইনার হিসেবে ৩ জন রয়েছেন। মেলা থেকে যে টাকা আয়

হয় তা দিয়ে হেন্ডিক্রাফটসে'র পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। দুঃস্থ মহিলাদের স্বাবলম্বী করার এই উদ্যোগটি সকলের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই কার্যক্রম যেন আরো সফলভাবে এগিয়ে যেতে পারে সে জন্য ২০০৫ সালে যুব উন্নয়ন থেকে ১০ হাজার এবং ২০০৬ সালে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর থেকে ৫ হাজার টাকা অনুদান পান। 'বন্ধন হেন্ডিক্রাফট্'-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে সকল হোম ওয়ার্কারদের নিয়ে কাজ করেন নাহিদ তারাই এই প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করে থাকেন। বলা যায় তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছেন নাহিদ। এদিকে 'বন্ধন হেন্ডিক্রাফটে'র কাজ পুরোদমে শুরু হলেও 'বন্ধন ডেভেলোপমেন্ট সোসাইটি'র কাজ এখন পর্যন্ত শুরু করা হয় নি। তবে এ বছরের জুন মাস থেকে কাজ শুরু করার আশা রাখেন নাহিদ।

শাখা মেলুক

একটি প্রতিষ্ঠান শুরু করতে পারেন নি ঠিকই কিন্তু তাই বলে বসে থাকেন নি নাহিদ। তার কাজের পরিধি আরো বাড়িয়েছেন। বাদুয়ারচর শতদল সমাজকল্যাণ সংস্থার কার্যক্রমের সাথে সকলের পরিচয় ঘটানোর জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত নরসিংদী সদর, কালীগঞ্জ সদর এবং ঢাকার মালিবাগে মোট তিনটি শাখা স্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়াও মযমনসিংহ ও কিশোরগঞ্জে প্রতিষ্ঠানের শাখা খোলা হয়েছে। ইউনিসেফ-এর সহায়তায় ১৩ মাসের এক স্বাস্থ্য জরিপ চালানো হবে সমগ্র কিশোরগঞ্জে। ইতোমধ্যেই কিশোরগঞ্জে দুটি অফিস করা হয়েছে এ কার্যক্রমগুলো পরিচালনার জন্য।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন

নারীদের অধিকার আদায়ে নাহিদ কাজ করে যাবেন আজীবন। তাই স্বপ্ন দেখেন নারী নির্যাতন একদিন বন্ধ হবে এই দেশে। নারী-পুরুষের মধ্যে থাকবে না কোন জেন্ডার বৈষম্য। স্বপ্ন দেখেন একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করার। এছাড়াও ভবিষ্যতে স্যানিটেশন ব্যবস্থা, শিশু শ্রম, প্রতিবন্ধী শিশু, আর্সেনিকসহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে কাজ করতে চান নাহিদ।

ছড়িয়ে পড়ুক সবখানে

মানুষের সেবা করাই যেন তার পরিচয়। তিনি সকলের প্রিয় নাহিদ আপা। কিন্তু মাঝে মাঝে তার মনে হয় তিনি কি সঠিক পথে এগিয়ে চলেছেন। কারণ একবিংশ শতাব্দীতে এসে আজও নারীরা পশ্চাৎমুখী। নির্যাতন আর শোষণের শিকার। তাহলে কি সত্যিকার অর্থেই নারীর উন্নয়ন হচ্ছে। এত অনিশ্চিয়তার মাঝে তবুও আশার আলো দেখতে পান নাহিদ। তাই তো থেমে থাকে নি তার পথ চলা। সকল বাধাকে জয় করে এগিয়ে চলছেন তিনি। তার শুধু একটাই চাওয়া, কোন একদিন পুরুষ শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে নারীরা রুখে দাঁড়াবে। আদায় করবে তাদের ন্যায্য অধিকার। আর আমাদের চাওয়া, তার এ স্বোচ্চার কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হোক সারা দেশে, ছড়িয়ে পড়ুক সবখানে।

নাটক নিয়েই জীবন নাটক

কাজী ফাতেমা বর্নালী

যুগে যুগে পৃথিবীর উন্নয়নে পুরুষের চেয়ে নারীই সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাকে বেশি চালু রেখেছেন। কিন্তু পুরুষ শাসিত এই সমাজ সেই ঐতিহাসিক সত্যকে চিরকালই অস্বীকার করে এসেছে এবং কৌশলে নারীদের সম্পর্কে নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে কিছু ভ্রান্ত ধারণা চালু করে দিয়েছে। সেই ভ্রান্ত ধারণার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলার লড়াই এখনো চলমান। এই লড়াইকে টিকিয়ে রাখার জন্য গ্রাম বাংলার আনাচে-কানাচে যে সকল নারী কাজ করে যাচ্ছেন মূলত তাদের কারণে আজকের নারীদের ক্ষমতায়ন অর্জিত হয়েছে। সেই ক্ষমতায়িত নারীদের একজন পূর্বাশা মৃধা মিলি। মিলির লড়াই ও অর্জিত সফলতা অনেকের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে।

পিরোজপুরের মেয়ে মিলি, জন্ম ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসের ১০ তারিখে। বাবা সতিশ চন্দ্র মৃধা ও মা অনুপমা মৃধা দু'জনেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মানুষ। তাই ছোট বেলা থেকে গান-বাজনার দিকে একটু বেশি ঝোঁক ছিল মিলির। মিলির বাবাদের ছিল যৌথ পরিবার। সংসারে সম্পদের প্রাচুর্য না থাকলেও সম্পদের অভাব ছিল না কখনো। নিজেদের জমি চাষ ও বিভিন্ন রকমের ফল যেমন আম, কলা, কাঁঠাল, সুপারির বাগান থেকে যতটুকু আয় হত তা দিয়ে মিলির বাবা-মায়ের সংসার চলতো। মিলিরা মোট ১২ ভাই-বোন, এর মধ্যে মিলির অবস্থান ছিল নবম। এই বিশাল সংসারে সন্তানদের জন্য ভালো লেখাপড়ার পরিবেশ দরকার। এ কারণে শিশু মিলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় রংপুরে মাসীর বাড়ীতে। মেসো ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের ডিএসপি। বসবাস করতেন রংপুর শহরের গোপ্তপাড়ার নিউক্রস রোডে। মেসোর বাড়ীতে থেকে ১৯৭৮ সালে ভর্তি হন রংপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে মাসীর তিন ছেলে মেয়ের সাথে বেশ আনন্দেই সময় কাটতো তার। রংপুরে খুব বেশি সময় থাকা হয় নি মিলির। ১৯৮১ সালে মেসোর মৃত্যুর পর আবার মিলিকে ফিরে আসতে হয় পিরোজপুরে। এখানে এসে ১৯৮২ সালে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে আবার বাবা মায়ের সাথে থাকা শুরু হয়। এ সময় মিলিদের আর্থিক অবস্থা খুব বেশি ভালো ছিল না। এই টানাপোড়নের মধ্যে ১৯৮৬ সালে পিরোজপুর সরকারী বালিকা বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করে পিরোজপুর মহিলা কলেজে ভর্তি হন। দু'বছর এখানে লেখাপড়া করলেও আর্থিক অনটনের কারণে এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়া হয় নি তার।

ছোট বেলা থেকে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সাথে যুক্ত থাকার কারণে পিরোজপুর শহরে পূর্ব থেকেই মিলির একটি পরিচিতি ছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পিরোজপুর 'দিশারী মিলন' গোষ্ঠীর সদস্য হয়ে নিয়মিত গান গাইতেন। এভাবে খ্যাতি ও পরিচিতি বাড়তে থাকে মিলির। এই পরিচিতিই মিলিকে আনসার একাডেমীতে সংগীত শিল্পী হিসেবে চাকুরি জুটিয়ে দেয়। সেটা ছিলো ১৯৯১ সালের ঘটনা। সেখান থেকে মাসে ২০০০ টাকা বেতন, থাকা খাওয়া ও রেশন সুবিধা পেতে শুরু করেন। চাকুরির কারণে আনসার একাডেমীর নিজস্ব অনুষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিদেশী অতিথিসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গাইতে হত তাকে। অনেক সময় ব্যক্তিগত সমস্যা, শারীরিক সমস্যা নিয়েও হাসি মুখে অনুষ্ঠান করতে হতো। ১৯৯৩ সালে শরীরে পক্স নিয়ে চীনের প্রধানমন্ত্রির অনুষ্ঠানে গান গাইতে হয়েছিল মিলিকে। এরপর ১৯৯৪ সালে টিভি প্রোগ্রামের কারণে পুঁজার ছুটিতে বাড়ি যাওয়া হয় নি তার। এই ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে চাকুরির প্রতি এক ধরনের বিরক্তি তৈরি হয় মিলির। যার ফলে পরবর্তী ছুটিতে বাড়ী গিয়ে আর ফিরে আসেন নি তিনি।

বাড়ী ফিরে মিলি হাতের কাজ ও গান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ সময় কাতার প্রবাসী বিমল চৌধুরীর সাথে পত্রমিতালীর মাধ্যমে সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৯৪ সালে বিমল দেশে ফিরে আসলে তারা বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। সেই বিয়ে নিয়ে এক ধরনের জটিলতা তৈরি হয়। সম্প্রদায়গত পার্থক্য ছিল এর মূল কারণ। সম্প্রদায়গতভাবে মিলিরা ছিল নমঃশুদ্র আর বিমল ছিল কায়স্থ ঘরের ছেলে। তাই এমন সম্প্রদায়গত অসম সম্পর্ক মেনে নেয় নি বিমলের বাবা-মাসহ আত্মীয়-স্বজনরা। শেষ পর্যন্ত আত্মীয়-স্বজন ছাড়াই ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসের চার তারিখে বিমলের সাথে মিলির বিয়ে হয়। বিয়ের পর বিমল

দুই মাস দেশে থাকলেও মিলির কাছে ছিলেন সব মিলিয়ে মাত্র পাঁচ দিন। দু'মাস পর বিমল পুনরায় কাতার চলে যায় এবং সেখান থেকে প্রতি মাসে মিলির জন্য খরচ পাঠিয়ে দিতেন। এর মধ্যে ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসের পাঁচ তারিখে মিলি প্রথম কন্যা সন্তানের মা হন। মেয়ের বয়স যখন দু'বছর তখন বিমল দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে আসার পর বিমল বিভিন্ন ব্যস্ততার অজুহাতে মিলি এবং তার মেয়ের জন্য মাত্র ১ দিন সময় ব্যয় করেন। বাবা-মা'র সাথে দুই মাস কাটিয়ে হঠাৎ একদিন মিলিকে না জানিয়ে পুনরায় দেশ ত্যাগ করেন বিমল। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে যান তিনি। কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। উল্লেখ্য যে, এসময় মিলি এবং বিমলের মধ্যে কোন মনোমলিন্য বা মান-অভিমানও চলছিল না। কাতার যাওয়ার পর বিমল পুনরায় মিলির সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং মিলি ও তার সন্তানের জন্য খরচও পাঠিয়ে দিতেন। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিমল শেষবারের মত ১০ হাজার টাকা মিলির বড় বোনের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়ে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। বাধ্য হয়ে মিলি বিমলের গ্রামের বাড়ী নোয়াখালীতে যান এবং সেখানে গিয়ে দেখেন যে, ঐ ঠিকানায় বিমলের বাবা-মা কেউই থাকে না। অন্যদিকে বিমল কাতারের ঠিকানাও পাল্টে ফেলেন। বিমলের এই প্রতারণায় মিলি মানসিক ও আর্থিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন।

কেটে যায় সময়। বড় হতে থাকে মিলির মেয়ে, বাড়তে থাকে সংসারের খরচ। মিলির তখনো বিশ্বাস ছিল যে, বিমল একদিন অবশ্যই তাদের খোঁজখবর নিবে এবং টাকা পাঠাবেন। স্বামীর টাকা আসবে এই আশায় ধার করে সংসার চালাতে শুরু করেন মিলি। এক পর্যায়ে ঋণের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায় এবং পরিশোধের সম্ভাবনা না থাকায় আত্মীয়-স্বজনরা ঋণ দেওয়াও বন্ধ করে দেয়। এই অবস্থায় জীবিকার ব্যয় নির্বাহের তাগিদে ঘরের আসবাবপত্রগুলো বিক্রি করতে শুরু করেন তিনি। স্বামীর কোন খবর না পাওয়া, মেয়ে বড় হওয়া, ধার বাড়তে থাকা এবং এই সুযোগে সমাজের ঘৃণ্য মানুষদের নানা কথা মিলির জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। নিজের পছন্দের বিয়ে বলে কাউকে সমস্যার কথা বলতে পারতেন না তিনি। এসময় অনেকবার আত্মহত্যার কথা ভাবলেও শুধুমাত্র মেয়ের কথা ভেবে তা করতে পারেন নি তিনি। তার এই কন্যা সন্তানই তাকে বেঁচে থাকার জেদ তৈরি করে দেয়।

জীবনের চরম সঙ্কটকালীন সময়ে তার পাশে এসে দাঁড়ান এলাকার পূর্ব পরিচিত এবং পিরোজপুরের নারী নেত্রী সালমা রহমান হ্যাপী। সালমা মিলির জীবনের সকল ঘটনাই জানতেন এবং মিলির জন্য কিছু একটা করার কথা ভাবতেন। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মিলির জন্য তিনি তেমন ভালো কিছু করতে পারছিলেন না। একদিন খবরের কাগজে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন সালমা রহমান হ্যাপীর নজর কাড়ে। সেখানে লেখা ছিল 'স্বল্প খরচে বিউটি পার্লারের কাজ শেখানো হবে'। বিজ্ঞাপনটি দেখে সালমা রহমান নিজ খরচে ২০০৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় ৪ মাস মেয়াদী একটি কোর্সে ভর্তি করে দেন মিলিকে। সালমা রহমানের অনুরোধে খুব মনোযোগ দিয়ে প্রশিক্ষণটি সম্পন্ন করে ফিরে আসেন তিনি। পিরোজপুর ফিরে এসে মেয়ের জন্য জমানো ১০০০ টাকা পুঁজি নিয়ে নিজ বাড়ীতে কাজ শুরু করেন। সালমা রহমান হ্যাপীর সহযোগিতায় অর্জিত এই শিক্ষা মিলির জীবনে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ভিত্তি তৈরি করে দেয়।

পার্লারের কাজ থেকে আয় করা সামান্য টাকা দিয়ে চলতে থাকে মিলি আর তার সন্তানের দিন। স্বল্প পরিসরে হলেও নিজের কিছুটা আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনের পর মিলির মনে হতে থাকে, যদি এমন কিছু একটা করা যেতো যার মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত ও বঞ্চিত নারীদের অবস্থার পরিবর্তন হবে, তাহলে জীবনটা সার্থক হত। কিন্তু ভাবনার সাথে মিল

পাওয়া কাজ খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি। বিষয়টি নিয়ে সালমা রহমান হ্যাপীর সাথে আলাপ করেন মিলি। সালমা রহমান তাকে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক কার্যক্রম ও স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠন 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশে'র উজ্জীবক প্রশিক্ষণ, উজ্জীবকদের সফলতার বিভিন্ন কাহিনী এবং সমাজের অবহেলিত নারীদের উন্নয়নের বিষয়ে অবগত করেন। উল্লেখ্য যে, সালমা রহমান হ্যাপী ১ম ব্যাচের নারী নেত্রী। তার উৎসাহ ও পরামর্শে ২০০৬ সালের ১ থেকে ৪ এপ্রিল ২য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন মিলি।

প্রশিক্ষণ চলাকালে তার সাথে পরিচয় হয় 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশে'র আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মাসুদুর রহমান রঞ্জুর সাথে। তার সাথে আলাপের মাধ্যমে এবং সালমা রহমানের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ২০০৬ সালের ৫ থেকে ৮ আগস্ট অনুষ্ঠেয় ৯৭৬ তম ব্যাচের উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি। প্রশিক্ষণটি তার মনোজগতে এক নতুন আলোড়ন তৈরি করে। জীবনের এ পর্যায়ে তার মনে হতে থাকে অনেকটা সময় এলোমেলো আর হতাশার মধ্যে নষ্ট হয়েছে। তাই এখনই সময় জীবনকে গুছিয়ে নেওয়ার আর মানুষের জন্য কিছু করার। এই বোধ তৈরি হওয়ার পর পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন মিলি। সেলাই, পার্লার, উপটান তৈরি, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও বৃক্ষরোপণসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান দিয়ে নতুন উদ্যোগে কাজ শুরু করেন। প্রথমেই পার্লার থেকে অর্জিত লাভের টাকা দিয়ে উপটান তৈরি শুরু করেন। সব মিলিয়ে মিলি এখন মাসে সাত থেকে আট হাজার টাকা আয় করেন। পার্লারের খরচ বাদ দিয়ে তিন থেকে চার হাজার টাকা লাভ থাকে মিলির। নিজের আয়ের টাকা দিয়ে কন্যা সন্তানকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলছেন। বাবা-মাসহ পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের সাধ্যমতো সহযোগিতা করেন। এছাড়া ২০০০ সালে তৈরি হওয়া উদ্দীপন সমিতির সভাপতি তিনি। সমিতির মোট সদস্য ৪০ জন। সমিতির সদস্যরা মিলির উৎসাহে নিজেদের সঞ্চিত টাকার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ ও বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অন্য মহিলাদের স্বনির্ভর হতে সহায়তা করে চলেছেন। নারীর ক্ষমতায়ন তথা নারীর অধিকার ভিত্তিক আন্দোলন সংগঠিত করণে মিলির পদচারণা এলাকার সকলের নজর কাড়ে। এলাকার নারীদের নিয়ে ইস্যুভিত্তিক কর্মশালা উঠান বৈঠক করার মাধ্যমে নারীদের সচেতন ও সংগঠিত করে চলছেন।

২০০৬ সালে তিনি নারী নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ নিয়ে নারীদের বিভিন্ন ইস্যুতে ১০টি উঠান বৈঠক ২০টি আলোচনা সভা ও টিআইবি'র সহযোগিতায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে ৯টি পথ নাটক করেন। এছাড়াও মিলি জাতীয় মহিলা পরিষদে স্বেচ্ছাসেবক হিসেব নারী নির্যাতন সংক্রান্ত বিষয়ে নারীদের সচেতন করা নিয়ে কাজ করছেন। মিলি ৩০টি উঠান বৈঠক ও আলোচনা সভার মাধ্যমে মোট ৬০০ জন নারীকে এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

মিলির এখন এত কাজ যে অতীতের ভয়, শঙ্কা, হতাশা নিয়ে চিন্তা করার কোনো সময় তার হাতে নেই। সারাদিন কাজ শেষে যে সময় অবশিষ্ট থাকে তা ব্যয় করেন একমাত্র কন্যা সন্তানের সাথে। মিলির ভাষায়, তার এই কন্যা সন্তানসহ সমস্ত কন্যা সন্তানদের নিশ্চিত ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার জন্য যা যা প্রয়োজন তা তিনি করতে প্রস্তুত। তার একটাই স্বপ্ন, ভবিষ্যতে আর কাউকে যেন তার মত প্রতারিত হতে না হয়। আমাদেরও প্রার্থনা, মিলির স্বপ্ন পূরণ হবে। আর এভাবেই হাজারো স্বেচ্ছাব্রতী মিলিদের মাধ্যমে তৈরি হবে আমাদের স্বপ্নের স্বদেশ প্রিয় বাংলাদেশ। সেই প্রত্যাশার জয় হোক, জয় হোক মিলির স্বপ্নের।

দিলারাঃ সুদূরের যাত্রী

আসমা আইয়ুব

বাবা আব্দুর রহমানের সাথে দিলারা রহমানের সম্পর্ক ছিল গভীর। বাবা লেখালেখির কাজ করতেন। এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি বলতেন আর দিলারা লিখতেন। অবসরে দু'জন অমিয়ধারায় কবিতা পড়তেন। আমাদের দেশের সংস্কৃতিতে বাবা-মেয়ের এ সম্পর্ক খুবই বিরল। দৃশ্যটি এককথায় অসাধারণ। এই মধুর দৃশ্যটির পেছনে দিলারার রয়েছে ততটাই বেদনা, তিক্ততা ও বিষাদ মিশ্রিত অনুভূতি। দিলারার জীবন এই মধুর দৃশ্যের সাথে ততখানিই বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। নারীরা যুগে যুগে যে ত্যাগ সাধন করেছে তার স্বাক্ষর সমাজ বিনির্মাণের প্রতিটি পড়োতে পড়োতে রয়েছে। সমাজের সৌন্দর্যগুলো তাদের ত্যাগের মহিমায় তৈরি হয়েছে।

আব্দুর রহমানের দ্বিতীয় স্ত্রী দিলারার মা সফুরা রহমান মাত্র ১৩ বছর বয়সে তাদের পরিবারে প্রবেশ করেন। প্রথম স্ত্রী এক ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে বহু আগেই মারা যান। সফুরা ও প্রথম স্ত্রীর সন্তানদের বয়স প্রায় কাছাকাছি। তারা কখন সফুরাকে পরিবারের অংশ বলে মেনে নিতে পারেন নি আর সম্পত্তির ভাগ দিতে হবে এই ভয়ে কখন চাইতেন না পরিবারে নতুন কোন সন্তান আসুক। কিন্তু বিয়ের এক বছরের মাথায় সফুরা গর্ভবতী হন। গর্ভবতী মায়েদের জন্য যে বিশেষ যত্ন প্রয়োজন তার কিছুই পান নি তিনি। বরং পরিবারের আয়োজনে ক্ষুধার্ত রেখে ও চুরির অপবাদ দিয়ে বিভিন্ন সময় তার ওপর চালায় নির্যাতন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে সফুরার প্রথম সন্তান দিলারার জন্ম হয়। দিলারার বাবা খেয়ালী ধরনের হওয়ায় সংসারের প্রতি তার কোন মনোযোগ ছিল না। এই সুযোগে প্রথম স্ত্রীর বড় ছেলে ধীরে ধীরে পুরো সংসারের কর্তৃত্ব নিয়ে নেয়।

পারিবারিক জটিলতার জন্য শৈশব থেকে অনাদর আর অবহেলায় বেড়ে উঠেন দিলারা রহমান। ৪ বছর বয়সে জামালপুর প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকের (সম্পর্কে খালুর) হাত ধরে স্কুলে যেতে শুরু করে। তখন পুতুল খেলা, ছোট ছোট হাড়ি পাতিলে রান্না করার যে আনন্দানুভূতি তার সাথে নতুন স্কুল, নতুন ক্লাস আর নতুন বই পাওয়ার নতুনত্ব সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়। সারাক্ষণ বই নিয়ে থাকতে ভালো লাগতো, মেধাবী ছিল দিলারা। স্বপ্ন ছিল অনেক পড়াশুনা করবে, বড় হবে। এভাবে স্বপ্নের ভেলায় চড়ে যখন পথ পাড়ি দিতে মগ্ন তখন দিলারার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল তার বড় সৎ ভাই, মেয়েদের পড়াশুনা করানো মানে পয়সা নষ্ট, তাই হঠাৎ করেই তৃতীয় শ্রেণিতে বন্ধ হয়ে যায় দিলারার লেখাপড়া। কেউ কান্না দেখে ফেলবে এই ভয়ে দরজার পেছনে লুকিয়ে কাঁদতেন। সে সময় তাদের পরিবারের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তার দূর সম্পর্কের এক ভাই তাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। দিলারার কান্না দেখে তার বাবার সাথে তিনি কথা বলেন। বাবা সংসারের প্রতি উদাসীন থাকায় জানতেন না যে, মেয়ে দিলারার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাবার অনুমতিতে স্কুলে যাওয়া শুরু হলেও তার পড়াশুনার সব খরচ বন্ধ করে দেয়। জামা কাপড়ও কিনে দেয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু মানুষ যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তবে সব বাধা অতিক্রম করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ খুঁজে নেয়। বিষয়টি নতুন না হলেও আমাদের জন্য

শিক্ষণীয়। দিলারার নানী বয়সে প্রবীন হলেও মানসিকতায় ছিলেন অনেক আধুনিক। বিধবা নানী তাকে পুরোনো বই অল্প টাকায় সংগ্রহ করে পাঠাতেন। তা দিয়ে দিলারা পড়াশুনা চালিয়ে যেতে থাকে।

দিলারার বাবার ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে বড় ভাই ব্যবসা ও দোকান তৈরি করে পরিবারের সব দায়িত্ব অস্বীকার করে বাড়ি থেকে চলে যায়। ফলে পরিবারকে অর্থনৈতিক সংকটে পড়তে হয়। অসুস্থ বাবার পক্ষে পুরো সম্পত্তির দেখভাল করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে বর্গাচাষীদের দিয়ে সম্পত্তির দেখাশুনার কাজ চলতে থাকে। বড় ভাই চলে যাওয়ায় বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলেও পরিবারের উপর তার খবরদারির অবসান হয়। পরিবারের গুমোট হাওয়া যেন আস্তে আস্তে কেটে যেতে থাকে।

মেধাবী দিলারা পড়াশুনায় পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তি পায়। ফলে পরিবারে তাকে কেন্দ্র করে সুদূরের পিয়াসী স্বপ্ন দেখার ভিত্তি তৈরি হয়। গ্রাম থেকে প্রায় এক মাইল দূরে হাইস্কুল, গ্রাম থেকে কোনো মেয়ে সেখানে পড়তে যেত না। কিন্তু শিক্ষক ও পরিবার তার সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে ১৯৭৫ সালে জামালগঞ্জ হাইস্কুলে ভর্তি করে দেয়। প্রথম প্রথম দিলারা স্কুলে গেলে বাবা সাইকেল নিয়ে তার পেছন পেছন যেতেন। এভাবেই ধীরে ধীরে দিলারা তার ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির পাট চুকিয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পদার্পন করে।

জীবনের স্বাভাবিক গতি হঠাৎ করেই যেন শ্লথ হয়ে যায় দিলারার। কিন্তু এই সম্ভাবনাময় মুক্ত জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ বন্ধ হয়ে যায় আমাদের পিছিয়ে থাকা সমাজের আকস্মিক ঝড়ে। ১৯৭৭ সালে তার বড় সৎ বোন আকস্মিকভাবে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রেখে মারা যায়। বোনকে তখনও দাফন করা হয় নি, কিন্তু এর মধ্যে গুঞ্জন উঠে দুলাভাইয়ের সাথে বিয়ের এবং এই গুঞ্জনই এক সময় চূড়ান্ত রূপ নেয়। অল্প কিছু দিনের মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের চাপাচাপিতে তার বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের কিছুদিনের মাঝেই সে জানতে পারে তার স্বামী নেশা করে। একসময় দিলারার স্বামী যক্ষা ও ব্রনকাইটিসে আক্রান্ত হয়। অসুস্থতার কারণে তাকে পরিবারের সদস্যদের সাথে একত্রে থাকতে নিষেধ করা হয় এবং হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে দিলারা গর্ভবতী হয়ে নিজের বাড়িতে আসে। কিন্তু এই সময়ের মাঝে শ্বশুরবাড়ির মানুষেরা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত করে। বিয়ের সময় বাবা তাকে চার কাঠা জমির উপর বাড়ি করে দিয়েছিলন শ্বশুরবাড়ির লোকেরা প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তার মৃত বোনের নাম থেকে দিলারার নামে করবে বলে দলিলে স্বাক্ষর নেয়। পরবর্তীকালে সেই স্বাক্ষর দিয়ে অন্য মেয়েকে দিলারা সাজিয়ে তার জমি ও বাড়ি আত্মসাৎ করে নেয়। এক বছর পর সন্তান নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে গেলে বাবার দেওয়া বাড়িতে উঠতে পারে না। এসব বিষয় জানাজানি হয়ে গেলে দিলারার বাবা মা তাকে নিয়ে চলে যান। বাড়িতে যাওয়ার চার দিনের মাথায় তাকে তালাকনামা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরই মাঝে দিলারা দুই সন্তানের জননী হয়।

বিপদ যেন দিলারার জীবনসঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিনিয়ত জীবন টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করে চলতে হয় তাকে। জীবনের এতটা কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে তিনি এতটুকু নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, তার ভার তাকে একাই টানতে হবে। এ কারণে এত টানাপোড়েনের মাঝেও হাল ছাড়েন নি তিনি। প্রচণ্ড পরিশ্রমী দিলারাকে পরিবারের সদস্যরা রাতে বা সকালে ঘুমাতে

দেখেন নি। খুব ভোরে আর গভীর রাত্রে কাজ করতেন তিনি। ১৯৮৩ সালে জয়পুরহাট কুটির শিল্প সংস্থা থেকে কুটির শিল্পের প্রশিক্ষণ নেন দিলারা। অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেলেও নবম ও দশম শ্রেণির বইগুলো বাড়িতে নিজে পড়ে ১৯৮৪ সালে এসএসসি পাশ করেন। ইউএনও পরিবারের সাথে তার ব্যক্তিগতভাবে সুসম্পর্ক ছিল। তিনি তাকে সমাজসেবা অফিসে ইন্সট্রাক্টর পদে দরখাস্ত করার পরামর্শ দেন। পরিবারের কাউকে কিছু না জানিয়ে দিলারা দরখাস্ত করেন। চাকরিটি তার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন হলেও পরিবারের রক্ষণশীলতা ও তার নিরাপত্তার অভাব বলে তাকে চাকরি করতে দেয় নি পরিবার।

এশিয়া ফাউন্ডেশন পরিচালিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা প্রজেক্টে ১৯৮৫ সালে রাজশাহীতে চাকরি পান দিলারা। এই সময় স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে প্রশিক্ষণ নেন। তখন থেকে রাজশাহীতে তার সন্তানদের নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের সূত্রপাত ঘটে। এমন করে স্বাধীনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন দিলারা। বাধা হয়ে দাঁড়ান বাবা, অনেক বয়স হয়েছে তার। মেয়ের একটি গতি করতে চায়, কিন্তু সেই গতি করার ইচ্ছা দিলারার জীবনে দুর্গতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৮৮ সালে আবার দিলারার বিয়ে হয় ম্যাচ ফ্যাক্টরীর ঠিকাদারের সাথে। বিয়ে মেনে নিতে পারেন নি দিলারা। সংসারকে কেন্দ্র করে সকল স্বপ্ন আর প্রত্যাশার সমাপ্তি ঘটেছে বহু আগেই, শুরু হয় বিভিন্ন ধরনের জটিলতা ।

দৃঢ় মনোবল, অসীম সাহস ও কঠোর পরিশ্রমে ১৬টি বছর পেরিয়ে গেছে। চাকরির পাশাপাশি বিকেলে ১০/১৫ জন করে ৪টি ব্যাচে তিন মাস মেয়াদে দুঃস্থ নারীদের কোন বিনামূল্যে সেলাই শেখাতেন। নিজের জীবন থেকে মেয়েদের স্বাবলম্বী করার একটা তাগিদ অনুভব করেন। নারীরা তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচি, ফিতা, সুতা নিয়ে আসতো। দিলারা তার নিজের মেশিন সেলাই করার জন্য তাদের দিতেন। তাদের সাথে সময় কাটাতে এক সময় উপলব্ধি তৈরি হয়, তারা পড়াশুনা জানে না, এমনকি তাদের ন্যায্য পাওনা বুঝে নিতে পারে না। তিনি সিদ্ধান্ত নেন তাদের পড়াশুনা করাবেন। নিজের অর্থ দিয়ে বই, চক, শ্লেট খেজুরের পাটি কিনেন। তার বাড়িতে পড়তে দিতেন। কিন্তু বাসায় এগুলো নিয়ে যেতে দিতেন না দিলারা। সঞ্চয়ের পরামর্শ দিয়ে তাদের সাবলম্বী করার চেষ্টা করতেন। সংগঠন তৈরির ভাবনা তার প্রথমে ছিল না, কিন্তু নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির সাথে সাথে তিনি সংগঠন তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। দিলারা সঞ্চয়ের ১০,০০০ টাকা দিয়ে তিনটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। পাঁচ জন মহিলা এখানে নারী ও শিশুদের পোশাক তৈরির কাজ করত ও ১৫ জন নারী নকশার কাজ করত মজুরির বিনিময়ে। দিশা নামের এই সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন হয় ২০০০ সালে। কাজের বিস্তৃতি ঘটতে শুরু করলে সংগঠনের কাজ পরিচালনার জন্য ৩৮ জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়। নির্বাহী কমিটি গঠিত হয় ৭ জন সদস্য নিয়ে আর সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয় ৩১ জন সদস্য নিয়ে। নির্বাহী কমিটির সদস্যরা প্রত্যেকে ১ লক্ষ টাকা করে দেন। প্রতি মাসে সংগঠন তাদের ১২৫০ টাকা দেয়। তবে দুঃস্থ নারীরা কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে সংগঠনের সাহায্য প্রত্যাশা করতেন। আর সেই প্রয়োজন মেটাতে ২০০০ সালের জুলাই মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে মাইক্রোক্রেডিটের কাজ শুরু করেন তিনি। এক থেকে দুই হাজার টাকা ঋণ দিতে শুরু করেন। বর্তমানে ৬০ জন নারী পোশাক ও নকশা তৈরির কাজ করছে। ইতোমধ্যেই ৪০ জন নারীকে সংগঠনের উদ্যোগে আলুর পাপড়, চানাচুর, মশলা, কলাই ডালের বড়ি বানানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

'দিশা' প্রতিবন্ধীদের নিয়েও কাজ করছে। এ পর্যন্ত ২৫ জন প্রতিবন্ধীকে হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ, কাপড় ও ঔষধ দিয়ে সহযোগিতা করছে। ২০০৭ সালের শীত মৌসুমে সংগঠনের সাথে যুক্ত প্রতিবন্ধী ও দুঃস্থ নারীদের শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। সংগঠনটি ২০০০ সাল থেকে এ যাবৎ ১০ জন মেয়েকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়িয়েছে। সংগঠনের সাথে যুক্ত সদস্যদের বাড়িতে কোন সমস্যা হলে মহিলা আইনজীবী সমিতি ও ব্লাস্ট্রের মাধ্যমে আইনী সহায়তা দিয়ে থাকে। বর্তমানে ৩,৫০০ পরিবারের সাথে দিশার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে। ২০০৪ সালে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশে'র কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ঘটে 'দিশা'র। জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের উদ্যোগে নারী দিবস ও কন্যাশিশু দিবস পালন করেছে। 'সুজনে'র দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন ইস্যুতে মানববন্ধন, গোল টেবিল আলোচনা, নির্বাচনী অলিম্পিয়াড এসব কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থেকেও সংগঠনটি ভূমিকা পালন করছে। নারীদের সাথে দিলারার সম্পৃক্ততা ও কাজের উদ্যম ও সফল উদ্যোগের কারণে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক প্রশিক্ষণে তাকে নারী নেত্রী হিসেবে মনোনীত করা হয়। ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে রাজশাহীর টিচার্স ট্রেনিং কলেজে নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

মানুষ পৃথিবীতে জন্ম নেয় অপার সম্ভবনা নিয়ে। এর মধ্যে অনেকে জীবনের প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতাকে ডিঙ্গিয়ে সমাজে অনেক অবদান রাখতে সক্ষম হয়। দিলারা তেমনই একজন মানুষ যিনি জীবনের প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে মাথা উঁচু করে বটবৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। বটবৃক্ষের ছায়ায় যেমন পথিক বিশ্রাম নিয়ে গন্তব্যে ফিরে যায়, তেমনি দিলারার ছায়ায় অনেক নারী কাজ শিখে স্বাবলম্বী হচ্ছে। ভবিষ্যতে তাঁর নারীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করার ইচ্ছে আছে যেখানে মেয়েরা বিভিন্ন কাজ শিখে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে। এছাড়া তিনি এমন একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে চান যেখানে নারীরা কাজ শিখবে সেখান থেকে তাদের উপার্জনের পথ তৈরি করতে পারবে।

নোয়াইলের বলিষ্ঠ নারী নেত্রী জাহেদা আক্তার মনি

সরস্বতী রানী পাল

নারী শব্দটি শুনলেই একটু কোমলতা আর স্নেহ-মমতার কথা মনে আসে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের মত। ভুল করে নয়, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের মত করে পৃথিবীতে একটি মানব শিশুর আগমন ঘটে। সময়ের সোপান বেয়ে সেই শিশু সন্তানটি বেড়ে ওঠে, বড় হয় এবং তার শারীরিক বৃদ্ধির সাথে বিকাশ ঘটতে থাকে মননের। দৈহিক পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তন আসে চিন্তা-চেতনায়। এভাবেই একটি মানব শিশু তার শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে পরিণত হতে থাকে একটি পূর্ণ মানব বৃক্ষে। পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠে সে একজন পূর্ণ মানুষ। পরিবার পায় একজন সুযোগ্য সন্তান, সমাজ পায় একজন সমাজসেবক আর দেশ পায় একজন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের দৃঢ় প্রত্যয়ীজন।

বৃহৎ এবং স্বল্প উভয় পরিসরে একটি কথা প্রযোজ্য। তা হল সুদৃঢ় আত্মপ্রচেষ্টা ও সুকৌশলী মানুষ পৌঁছে যেতে পারে সফলতার দ্বার প্রান্তে। এই বাক্যটি যার উদ্দেশ্যে তার নাম জাহেদা আক্তার মনি। মোহাম্মদপুরের ৩/৭ আসাদ এভিনিউ-এর ৫ তলায় জানুয়ারি ২০০৭, দ্বিতীয় সপ্তাহে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক একদিনের একটি অনুবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অংশগ্রহণকারী একজন নারী নেত্রী জাহেদা আক্তার মনি। মাসিক কর্মপরিকল্পনা এবং কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য এ কর্মসূচির আয়োজক দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ।

জাহেদা আক্তার মনি, একটি বলিষ্ঠ নারী নেতৃত্বের নাম। বলিষ্ঠ বাচনভঙ্গী আর কথা বলার আগ্রহই বলে দেয় তার কাজের ধরন এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা। অনুবর্তনের শেষ মুহূর্ত, শীতের পড়ন্ত বিকেল। জাহেদা আক্তার মনির সাথে পরিচয় হয়, কথা হয়। বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের এই নারীর বক্তব্য যে কাউকেই আকৃষ্ট করবে। কথা বলতে গিয়ে তার জীবনের কিছু বাস্তব ঘটনা জানা হল।

সোনারগাঁয়ের আদমপুর গ্রাম। এই গ্রামে জাহেদা আক্তার মনির জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। পিতা নূরুল ইসলাম ছিলেন বস্ত্র ব্যবসায়ী। মা রাবেয়া খাতুন গৃহিণী। ১৯৭২ সালের ৪ মে মনির জন্ম। মধ্যবিত্ত পরিবারের নয় ভাই-বোনের মধ্যে মনি ছিলেন পঞ্চম। পরিবারের সদস্য সংখ্যা অধিক হলেও কারো অধিকারই ক্ষুণ্ন হয় নি। তাই শৈশবের স্মৃতিতে কোন অভিযোগের গল্প নেই। তবে মাতৃস্নেহের স্মৃতি এবং মায়ের সর্বকর্মের পারদর্শিতা তাকে ভীষণ মুগ্ধ করত।

বাবার ব্যবসায়ের সূত্র ধরে শৈশবে মনির বেশ ক'টি স্কুল পরিবর্তন করতে হয়েছে। পবিবর্তিত বিভিন্ন স্কুলে তার পড়াশুনা চলতে থাকে। পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলায় আগ্রহী ছিলেন। ভলিবল, গোলকনিক্ষেপ, হকিসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানটি তার দখলেই থাকত। এছাড়া গার্লস গাইডের সদস্য হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় প্রচারাভিযান সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতেন। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় পারিবারিক সম্মতিতে মনির বিয়ে হয়। বিয়ের পর সংসার জীবনের সাথে পড়াশুনাও চালিয়ে যান। সোনারগাঁ জিআর ইনস্টিটিউট স্কুল থেকে ১৯৮৭ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এসএসসি পাশ করেন। এরপর সোনারগাঁ ডিগ্রী কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ভর্তি হন।

মনি একদিকে কলেজ অন্যদিকে সংসারের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এসময়ে জীবন নদীর স্রোতের গতিপথের বাঁক বদলে যায়। সন্তান সম্ভবা হওয়ার কারণে কলেজ জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ফলে ১৯৮৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু মনির অদম্য ইচ্ছশক্তির গুণে বাড়িতে বসেই দেবর, ভাসুর, ননদের সন্তানদের প্রাইভেট পড়ানোর দায়িত্বটি নিজ থেকেই নিয়ে ছিলেন। পাশাপাশি পাড়ার অন্যান্য ছেলেমেয়েদের পড়াতে শুরু করেন। প্রচণ্ড আগ্রহের কারণে তিনি এই কাজটি করতেন। তার ভাষায়, "কেউ দশ টাকা কেউ বিশ টাকা আর কেউ বা কিছুই দেয় না, বিনামূল্যে বিদ্যা বিতরণ করেছি; কারণ বসে থেকে সময় নষ্ট করার পক্ষে ছিলাম না আমি।"

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী এই নারী বর্তমানে দু'ই কন্যা সন্তানের জননী। স্বামী মোহাম্মদ আলী শিল্পপতি। তিনি রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো পৌরসভার জুয়েল টেক্সটাইল মিলের মালিক। ব্যবসার পাশাপাশি খাগুটিয়া মসজিদ কমিটির সভাপতি এবং বাসুয়া দীঘির পাড় মাদ্রাসার সদস্য হিসাবে কাজ করছেন। স্বামী মোহাম্মদ আলীর একান্ত সহযোগিতায় জাহেদা আক্তার মনির এগিয়ে চলার পথ সহজ হয়েছে। বড় মেয়ে মরিয়ম জাহান মৌরী ১৯৮৮ সালে এসএসসি পরীক্ষার পর বিবাহিত জীবন যাপন করছে। আর ছোট মেয়ে মৌমিতা জাহান মেম ২০০৭ সালে গ্রীন চাইল্ড কিন্ডার গার্টেন স্কুলে প্লে-গ্রুপে পড়াশুনা করছে।

১৯৮৬ সালে প্রথম সন্তান মৌরীর জন্মের পর তাকে নিয়ে শুরু হয় আরও একটি দায়িত্ব। এলাকার 'রাজদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়' এর পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ শুরু করেন। এই দায়িত্ব পালন বর্তমান সময় পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। স্কুল কমিটির সাথে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয় মনির। "দরিদ্র অভিভাবকদের নানা সমস্যা উপলব্ধি করতাম। তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করার কথা মনে হত। কিন্তু কিভাবে কি করা যায় এটা ঠিক বুঝতে পারতাম না" বলছিলেন মনি আক্তার।

শ্বশুরগৃহে মনি ছিলেন মেজো ছেলের বউ। তাই বড় বউয়ের পাশে তার দায়িত্বটিও কম নয়। শ্বশুরের বারো ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসারের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ জন। মনির শ্বশুরগৃহে একমাত্র দরিদ্রতার অভিশাপ ছাড়া আর কোন সমস্যা ছিল না। বড় পরিবারের অভাবী সংসারে স্বভাবতই নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি হত, যা একান্নবর্তী সংসারের একটি সাধারণ বিষয়। সংসার, ছাত্রছাত্রী পড়ানো এবং স্কুল কমিটির দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে কেটে গেছে মনির জীবনের বেশ কয়েকটি বছর।

১৯৯৭ সাল। মনির জীবনের স্মরণীয় অধ্যায়। স্কুল কমিটির সদস্যদের উদ্দীপনা ও উৎসাহে মনির ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার পদের প্রার্থী হন। সোনারগাঁ আমিনপুর ইউনিয়ন ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের মেম্বার নির্বাচিত হন। ১৯৯৭-২০০১ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্বটি বেশ সাফল্যের সাথেই পালন করেন। ফলে নেতৃত্বের সাফল্যমণ্ডিত দ্বার আরও উন্মুক্ত হয়। ২০০২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে জাহেদা আক্তার মনি সোনারগাঁ পৌরসভার কমিশনারের দায়িত্ব পালন করছেন।

"এলাকার সামাজিক কর্মকাণ্ডগুলির মধ্যে একজন পৌর-কমিশনারের দায়িত্বটি পালন করছি। যেমন, আইন-শৃংখলা রক্ষা করা এবং এ বিষয়ে প্রশাসনকে সহায়তা করা; কৃষি, বৃক্ষরোপণ, মৎস্য ও পশু পালন, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প, সেচ যোগাযোগ; পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের প্রসার ঘটানো; স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহ প্রদান করা; জন্ম-মৃত্যু, অন্ধ ও দুঃস্থদের নিবন্ধন করা; সকল ধরনের কার্যাবলী পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ করা"- এভাবে তার কাজের ফিরিস্তি দিচ্ছিলেন মনি।

'নোয়াইল নারী কল্যাণ সমিতি'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি জাহেদা আক্তার মনি। ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সমিতির বহুমুখী কার্যক্রম বর্ণনা করতে গিয়ে জাহেদা আক্তার মনি বলেন, "প্রথমত, বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। নারীর আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কুটির শিল্পের প্রশিক্ষণের সুযোগ যেমন, সেলাই, সুচিকর্ম, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, হাঁস-মুরগী পালন করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নারীর জন্য এই আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থা রয়েছে। মূলত সামাজিক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণগুলো এখানে বেশি হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, শিশুদের জন্য কোরান শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। বিশেষত কন্যাশিশু, যারা একটু বড় এবং মসজিদে যেতে সামাজিক বাধা, তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র

কোরান শিক্ষার আসর। কায়দা থেকে কোরান শরীফ শিক্ষা কার্যক্রমে এলাকার সকল শিশুর জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। তৃতীয়ত, ঋণ কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে এককালীন এবং দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী ঋণের সুযোগ। আত্মকর্মসংস্থানের জন্য এই ঋণ গ্রহণের সুযোগ। সোনারগাঁ স্থানীয় একটি ব্যাংকে 'নোয়াইল মহিলা কর্মদল' নামে একটি হিসাব নম্বর রয়েছে। ব্যাংকে সমিতির মাসিক সঞ্চয় জমা করা হয়। সদস্য ফি ১০ (দশ) টাকা। প্রত্যেক সদস্যের মাসিক চাঁদার পরিমাণ ২০ (বিশ টাকা)। সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৪০ জন।

২০০২ সালের ২৯ ডিসেম্বর। ১৯৭তম ব্যাচের উজ্জীবক। 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ' আয়োজিত উজ্জীবক প্রশিক্ষণের সময়টি ছিল মনির জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। ছয় মাসের কন্যাশিশুকে নিয়ে প্রশিক্ষণে এসে ব্যতিক্রমি অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়। মনির মতে, চার দিনই কন্যাশিশুটিকে রেখেছেন আয়োজক কমিটির কেউ না কেউ। এই অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত হয় বেশ কিছু ভাল লাগা। এমন এক ধরনের শক্তির সঞ্চয় করেছেন যা বিগত কোন প্রশিক্ষণেই সম্ভব ছিল না। লুক্কায়িত আত্মশক্তির গুণেই সম্ভব হয়েছে অনেক কিছু করা।

২০০৬ সালের জুন মাসে জাহেদা আক্তার মনির কাজের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশে'র স্বেচ্ছাব্রতী কার্যক্রমের পাশাপাশি 'নারী নেতৃত্বের বিকাশ' প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ ঘটে। তিন দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণের পর থেকে সোনারগাঁয়ের নারী নেতৃত্বের কাজটি করে যাচ্ছেন। উজ্জীবক প্রশিক্ষণ এবং নারী নেতৃত্বের সূত্র ধরে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ' এর অফিসে নিয়মিত আসা-যাওয়া। প্রতিমাসের অনুবর্তনের (ফলোআপ) জন্যই যোগাযোগ থাকে প্রতিনিয়ত। মনির মতে, "কাজের মধ্যে দিয়ে একদল উজ্জীবিত মানুষকে ধরে রাখা হয়। এই বিষয়টিই হল 'দি হাঙ্গার প্রজেক্টে'র সবচেয়ে বড় মহতী একটি উদ্যোগ।" মাসিক অনুবর্তনের দিনটি ছিল আজ (১৩ জানুয়ারি, ২০০৭)। জানা হল বিগত দিনের নারী নেতৃত্ব বিকাশের তার কাজের অগ্রগতি।

মাসিক অর্জন: নারী নেতৃত্বের বিকাশ শীর্ষক অনুবর্তন (ফলোআপ) বৈঠক

ক্রম	কার্যক্রম	স্থান	নারী	পুরুষ
১.	নারী সমাবেশ (নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য)	সোনারগাঁ উপজেলা হল রুম	৫০	৩০
২.	'আর নয় যৌতুক' শীর্ষক নাটিকা	জাহেদা আক্তার মনি কমিশনারের বাড়ির আঙ্গিনায়	৮২	৭৫
৩.	মা সমাবেশ শিশু ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কে	রাইজদিয়া স্কুল প্রাঙ্গন	৪০	৪৫
৪.	শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য প্রাথমিক বৃত্তি, মাধ্যমিক বৃত্তি ও এসএসসি এ প্লাস অর্জনকারীদের মাঝে গাছের চারা এবং সনদপত্র বিতরণ	আদমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ	৯০	৮০
৫.	উঠান বৈঠক (বাল্যবিবাহের কুফল ও যৌতুক নিয়ে আলোচনা)	নোয়াইল নারী কল্যাণ সমিতির মাঠ	২০	১৮
৬.	বেগম রোকেয়া দিবস পালন	সোনারগাঁ	৩০	১৯
৭.	'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ' শীর্ষক আলোচনা	সোনারগাঁ	৫৫	১০০
৮.	মহিলাদরে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ	সোনারগাঁ	৩০	০৮

উজ্জীবক প্রশিক্ষণ, নারী নেতৃত্ব বিকাশসহ রয়েছে মনির আরও কিছু প্রশিক্ষণ। ২০০৫ সালের জুন মাসে সম্পন্ন করেন ভূমি জরিপের উপর আমিনের প্রশিক্ষণ। 'আপগ্রেড সেবক প্রশিক্ষণ' নেওয়ার পর ভূমিহীন, ভূমি দখল হারিয়ে যাওয়া ভূমি

পুনরুদ্ধার করার জন্য কাজ করেন। কমিশনারের দায়িত্ব পালন, সমিতির কার্যক্রমের পাশাপাশি রয়েছে তার আরও কিছু কার্যক্রম। সোনারগাঁও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্য হিসাবে বিভিন্ন আইনী সহায়তার জন্য কাজ করে থাকেন। বিবাহ বিচ্ছেদ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পারিবারিক নির্যাতন বিষয়ে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন।

নিজ বসত বাড়িতে আছে একটি পুকুর। পুকুরে রয়েছে মৎস্য চাষ প্রকল্প। স্বামী মোহাম্মদ আলীর সাথে যুক্ত হয়ে পরিবারের সবাই মিলে এখানে একটি নির্দিষ্ট ব্যয় করে থাকেন। বাৎসরিক আয়ের লভ্যাংশ সকলে সমপরিমাণে ভাগ করে ভোগ করে থাকেন। লভ্যাংশের পরিমাণ প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা। পরিবারের এই বাড়তি আয়টুকু ব্যয় হয় ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে। মনি তার আয়ের অংশ ব্যয় করেছেন বৃক্ষরোপণের কাজে। ২০০০ সালে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা ব্যয়ে পুকুরের চারদিকে বিভিন্ন বনজ বৃক্ষরোপণ করেছিলেন। মাত্র দুই টাকা চারা গাছের প্রতিটির মূল্য এখন এক হাজার টাকা। এই মূল্যবান বৃক্ষগুলোকে বিক্রয় করার পর নতুন করে ফলজ বৃক্ষরোপণ করার ইচ্ছা রয়েছে তার।

জাহেদা আক্তার মনির ভাষায়, "এসকল কাজের পেছনের শক্তিতে ছিলেন দু'জন। শৈশবে আমার মা আর বিবাহের পর আমার স্বামী মোহাম্মদ আলী। এক অদৃশ শক্তি যা আমাকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। মা বেশ সাজানো গুছানো সংসার করতেন। এমন কোন কাজ নেই যা মায়ের জানা ছিল না।" মনির মায়ের গুণটি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আর স্বামীর পূর্ণ সম্মতি ও অনুপ্রেরণায় এগিয়ে যাওয়া সহজ হয়েছে। এছাড়া মামা শ্বশুর হাজী আহ্সানউল্লা জিআর স্কুল এ্যান্ড কলেজের ম্যানিজং কমিটির মেম্বার ছিলেন। জীবনে এগিয়ে চলার পথে মামার অবদান অনেক বেশি। বিশেষ করে মহিলা মেম্বার হওয়ার পেছনে তার অবদানই সবচেয়ে বেশি।

পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠা একজন মা, সমাজসেবী এবং নারী নেত্রী। ব্যক্তি তার কর্ম গুণটি দিয়ে হতে পারে সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী ও সুকৌশলী একজন পরিপূর্ণ মানুষ। পৌঁছে যেতে পারে সফলতার দ্বার প্রান্তে। শুরুতেই এই বাক্যটি ছিল জাহেদা আক্তার মনির উদ্দেশ্যে। নিজ দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে সকলের ভালোবাসায় ধন্য হয়ে মায়ের উত্তরাধিকার গুণ আর স্বামীর অনুপ্রেরণা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন নোয়াইলের বলিষ্ঠ নারী নেতৃত্ব জাহেদা আক্তার মনি।

আত্মশক্তির সমৃদ্ধি ঘুচিয়ে দেয় জীবনের সীমাবদ্ধতা

সরস্বতী রানী পাল

আমাদের স্থির বিশ্বাস আত্মশক্তিতে বলীয়ান মানুষ কখনই নিজেকে নিঃস্ব অসহায় মনে করেন না। সেই বিশ্বাসের শক্তিটি সমৃদ্ধ করে মানুষের জীবন, এবং ঘুচিয়ে দেয় জীবনের সীমাবদ্ধতা। আত্মশক্তিতে বলীয়ান এক নারী তাহ্মিনা হক পাপলী। পাপলী তার আত্মশক্তির প্রবল বিশ্বাস আর সাহসী সংগ্রামে বিদ্যমান বাস্তবতার প্রতিবন্ধকতাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন। আঘাতে সাময়িক আহত হয়েছেন, খুব বেশি হলে ক্ষণকাল থমকে দাঁড়িয়েছেন ক্ষণিকের তরে; তবে এর বেশি কিছু নয়। প্রতিটি আঘাতের প্রতিমুহূর্তেই কঠোর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন নিজের কাছে। যতটুকু শক্তি হারিয়ে গেছে ঠিক তার দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে আবার দাঁড়িয়েছেন। পরনির্ভরতা-অবমানার গ্লানিময় জীবন যেখানে এদেশের নারীদের বিবেচনায় নয়, সেখানে পাপলীর সফলতা শুধু নারীদের বিবেচনায় নয়, সমাজের সাধারণ বিবেচনাতেও গুরুত্বপূর্ণ এবং অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

সিরাজগঞ্জ জেলার বাসিন্দা পাপলী বর্তমানে 'মানবী' নামে একটি বহুমুখী মহিলা সমবায় সমিতিতে কর্মরত আছেন। মানবীতে কর্মরত থাকার সুযোগে এই প্রতিষ্ঠানের হোস্টেলে নিজ কন্যা আফিফা আশরোফি ঐশিকে নিয়ে থাকার আবাসিক সুবিধা পাচ্ছেন। সিরাজগঞ্জ জেলার শাহাজাদপুর থানার খুকনী গ্রাম। এই গ্রামের মেয়ে তাহ্মিনা হক পাপলী। খুকনী গ্রামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দু'বছর পর পাপলীর জন্ম। পিতা মোজাম্মেল হক ছিলেন খুকনী গ্রামের ব্যবসায়ী এবং সম্মানী ব্যক্তি। মা ছিলেন গৃহিণী। দশ ভাই-বোনের মধ্যে পাপলী ছিলেন চতুর্থ। পাপলী ছেলেবেলায় খুব কোমল স্বভাবের ছিলেন। যে স্বভাবগত প্রকৃতিটি তিনি আজও ধারণ করে আছেন। খুকনী গ্রামে জন্ম, বেড়ে ওঠা এবং জীবনের বেশ কিছুটা সময় কেটেছে তার। ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনা করার অনেক ইচ্ছা ছিল পাপলীর। এই ইচ্ছাশক্তির গুণটিই ছিল তার একমাত্র সম্বল। খুকনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়ার পর ভর্তি হন খুকনী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে। এই স্কুল থেকে ১৯৮৬ সালে মানবিক বিভাগ থেকে এসএসসি পাশ করেন।

খুকনী গ্রামের আশপাশে কোন কলেজ ছিল না। দূরের কলেজের যাতায়াত ব্যবস্থাও সহজ নয়। পাপলীর পরীক্ষা পাশের সংবাদ যেন আনন্দের চেয়ে বেশি কষ্টের। কারণ পরিবারের কেউ কলেজে পড়ে নি। ফলে পারিবারিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও ১৯৮৮ সালে ভর্তি হন পাবনা এ্যাডওয়ার্ড সরকারী কলেজে। কলেজে কোন আবাসিক ব্যবস্থা ছিল না বলে মামার বাড়িতে থেকে নিয়মিত কলেজে যেতেন। কিন্তু খুকনী গ্রামবাসী পাপলীর এই গ্রাম ছেড়ে পড়তে আসাকে সহজে মেনে নেয় নি। অন্যদিকে মামার বাড়ির লোকজন ও প্রতিবেশী বাসিন্দার পীড়াদায়ক নানা আপত্তিকর কথা বলতে থাকে। 'পড়তে নয়, প্রেম করতে এসেছে, পড়ার নামে রঙঢঙ এখানে চলবে না। তাদের মানসিকতার এরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাবে পাপলী হতবাক হয়ে পড়ে। মাত্র তিনমাস সময়ের ব্যবধানে ভেঙে যায় তার স্বপ্ন। এক বুক ব্যথা নিয়ে পাপলী ফিরে আসেন খুকনী গ্রামে।

গ্রামে ফিরে অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়া জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে সময় বয়ে যায় পাপলীর। অসমাপ্ত কলেজ জীবন তার জন্য যেমন কষ্টের, তেমনি তার মাও খুব ব্যথিত হলেন। ১৯৮৮-১৯৯৪, অসমাপ্ত কলেজ জীবন থেকে খুকনী গ্রামে ফিরে

পাপলীর সময় কাটে পরিবারে কাজ করে। ছোট ভাই-বোনকে পড়ানোর সাথে পাড়ার অন্যান্য ছেলেমেয়েদের পড়াতে শুরু করেন। পাশাপাশি উল, কুশকাঁটা, সুঁচিকর্ম এবং টেইর্লাসের কাজ চালিয়ে যান। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে মাটির ঘর-উঠান লেপন করা, মাকে রান্নায় সহায়তা করা এবং গরু পালন চলে নিয়মিত। কলেজে যাওয়া নেই তাতে কি, বাড়িতে বসে পড়ার ইচ্ছায় পাপলী নিয়মিত পড়াশুনা করে যান। পরিবারে অনেক কাজের ভীড়েও এই পড়তে পারার আনন্দটুকু তার জন্য অনেক পাওয়া হত। নানা ব্যস্ততার মাঝেও গৃহের এক কোণে খুব সুন্দর করে একটি বাগান করেছিলেন। যে বাগনটির বিচিত্র ফুলের সৌরভের মতই সুরভিত হত পাপলীর প্রতিদিনের অনুপ্রেরণামূলক জীবন।

পাপলীর অনুপ্রেরণামূলক জীবনের গতিপথ আবার জেগে ওঠে ইচ্ছাশক্তির গুণে। সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচিত হয়। খুকনী গ্রামে প্রথমবারের মত একটি নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৪ সালে 'ঘোড়াশাল সাহিত্যিক বরকত উল্লাহ কলেজ' এ পাপলী ভর্তি হন উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষে। মাত্র তিন মাস সময়ের ব্যবধানে তার জীবনে আবার বিপর্যয় নেমে আসে।

পিতা মোজাম্মেল হকের ইচ্ছা মেয়েকে বিয়ে দেবেন। ১৯৯৫ সালের ২৬ জানুয়ারি পাপলীর বিয়ে হয় পারিবারিক সম্মতিতে। কলেজ থেকে ডেকে এনে পাত্রী দেখানোর বিষয়টি পাপলীকে মর্মাহত করে। মাত্র একদিনের ব্যবধানে পাপলীর নতুন জীবন শুরু হয়। স্বামী আবুল কালাম আজাদকে বাসর রাতের প্রথম দেখাতেই ভাল লাগে নি। পাপলীর ভাষায়, "সে রাতের বিভৎস ঘটনা মনে পড়লে আজও আমার গা শিউরে উঠে। শুধুমাত্র একটি ফুলের মালা দিয়ে বিয়ে হয় আমার। তারপরও সব মেনে নিই, বিয়ে যখন হয়ে গেছে এখন তো আর পথ নেই।" বিয়ের মাত্র অল্প ক'দিনের মধ্যেই ঢাকার মোহাম্মদপুরের সলিমুল্লাহ রোডে শ্বশুরবাড়িতে আসেন। কাজের মেয়েকে নাকোচ করে দেওয়া হয়। পনের সদস্য বিশিষ্ট সংসারের সকল কাজ পাপলীকে একা করত হত। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িই সব, বাবার এই আদেশবাক্যকে শিরোধার্য করে সংসার করছিলেন। বিয়ের মাত্র ত্রিশ দিনের মধ্যে শ্বশুরের মৃত্যুতে পাপড়ির জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। মূলত বিয়ের পর থেকে নির্যাতন শুরু হয়। শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার নির্যাতনই সইতে হয়। নীরব সম্মতিতে সব মেনে নিয়ে পাপলী এগিয়েছেন এটাই জীবন এই ভেবে। ১৯৯৭ সালে পাপলী প্রথম সন্তানের মা হন। কন্যা আফিফা আশরোফি ঐশীর কথা ভেবে পাপলী অনেক কিছুই মেনে নিতেন কিন্তু নির্যাতনের মাত্রা এত বেড়ে গেল যে এবার আর টিকে থাকা সম্ভব নয়। কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবলেন।

বিয়ের পর যখন বাবার বাড়ি খুকনীতে বেড়াতে যেতেন তখন পাপলী প্রায়ই ভাবতেন আর ফিরবেন না। কিন্তু বিধাতার কী এক অলিখিত নিয়মে আবার শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসতে হত। ১৯৯৮ সালে শ্বশুরবাড়ি থেকে এক রকমের পালিয়েই বাবার বাড়ি খুকনী গ্রামে চলে আসে পাপলী। গ্রামে ফিরে এসেও কোন সমর্থন পেলেন না। আবার সেই ঘর-সংসারের কাজ চলে তার সেই সাথে মেয়ে ঐশীকে লালনপালন করেন। কিন্তু এভাবে যে আর দিন যায় না। ১৯৯৯ সালে ভাইয়ের এক বন্ধুর মাধ্যমে সবুজ ছাতা পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবয় স্বেচ্ছসেবী হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান। কিছু করার সুযোগ পেয়ে তিনি ধন্য হন। হোক তা স্বেচ্ছাসেবীর কাজ। 'সবুজ ছাতা পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা'য় একজন স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কাজ করেন মাসিক পাঁচশত টাকা বেতনে। এছাড়া ঔষধ বিক্রির বিনিময়ে মাসিক কিছু কমিশন মিলত। বেতন, কমিশনের সামান্য অর্থ মিলে পাপলীর জীবন চলে যাচ্ছিল। এখানে তিনি প্রায় চার বছর কাজ করেন। এরপর বাবার মৃত্যুতে পরিবারে নেমে আসে বিপর্যয়। ফলে তার উপরে চাপ বাড়তে থাকে। অন্যদিকে শ্বশুরবাড়ির টানাটানির জীবন থেকে মুক্তি পেতে ২০০০ সালে নিজেই সিদ্ধান্ত নেন বিবাহ বিচ্ছেদের। যেহেতু বিচ্ছেদ স্ত্রী'র পক্ষ থেকে তাই মুসলিম পারিবারিক আইন মোতাবেক তিনি কোনরূপ ভরণপোষণ পেলেন না।

২০০৩ সালে পাপলী তার ছোট বোনের সাথে আবার ঢাকা আসেন। মিরপুর বড়বাগ এলাকায় উঠলেন। ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগে না। তাছাড়া বোনের সংসারে বোঝা হয়ে থাকা শোভনীয় নয়। মেয়ে ঐশীর ভবিষ্যতের ভাবনাও রয়েছে। বোনজামাইয়ের সহযোগিতায় মিরপুরের একটি গার্মেন্টেসে অভ্যর্থনা বিভাগে কাজের সুযোগ পান। মাসিক আড়াই হাজার

টাকা বেতনের এই কর্মসুযোগ পাপলীর অনেক বড় পাওয়া। এখানেও সমস্যা তার পিছু নেয়। স্বামী আবুল কালাম আজাদ কেমন করে যেন জানতে পারে তার এই কর্মস্থলের খবর। ফলে শুরু হয় টানা-পোড়ার জীবন। অফিসের মালিক এবং চেয়ারম্যানের সাথে গোপনীয় যোগসূত্র স্থাপন করে পাপলীর মেয়ে ঐশীকে অপহরণ করার চেষ্টা করে। বেশ কয়েকবার সে চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে একসময় স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করাতে বাধ্য করে এবং ঐশীকে নিয়ে যায়। শুরু হয় মাতৃত্বের এক করুণ হাহাকার। কিন্তু তাতে শুধু মিথ্যা সান্ত্বনা ছাড়া আর কিছুই মিলল না। আত্ম-আহাজারিতে কেটে যায় বেশ কিছুটা সময়।

২০০৪ সালে মিরপুরে অপর একটি গার্মেন্টসে কাজের সুযোগ পান। পূর্ব কাজের অভিজ্ঞতা থাকায় এবার বেতন হয় মাসিক তিন হাজার টাকা। আগের মতই অভ্যর্থনাকারী হিসেবে কাজ শুরু করেন। কিন্তু মাত্র চার/পাঁচ মাস সময়ের ব্যবধানে পাপলী বুঝতে পারে ভিন্ন কিছু! মেয়ে মানুষের বিড়ম্বনা যে প্রতি পদে তা তিনি এবার বুঝতে পারলেন। তাই কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন পাপলী।

গ্রামের পথ বন্ধ, বোনের বাড়িতে বোঝা, আবার শহরেও পাপলী ঠিক মানাতে পারছিলেন না। গ্রামে ফিরে যাওয়া মানেই আবার সেই গ্লানিময় পথে যাওয়া। তাই ভাবলেন শহরে থেকেই কিছু করবেন। ঘরে ফিরে সিদ্ধান্ত করেন টেইর্লাসের কাজ করবেন। তাই বোন জামাইকে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করে দেওয়ার কথা বলেন। তিনি এক বাক্যেই মেনে নেন। শুরু হয় পাপলীর স্বাবলম্বী জীবন। গ্রাম, বোনের বাসা কোথাও আর নয়। নিজেই বাসা ভাড়া নিয়ে থাকবেন। উল্লেখ্য, ঐশী কিছুতেই তার বাবার কাছে থাকতে চাচ্ছিল না। ফলে মেয়ে ফিরে আসে তার মায়ের কাছে। ঘরে বসে নিজের মত (এ কাজের কোন প্রশিক্ষণ ছিল না) করে সেলাইয়ের কাজ করতেন পাপলী কিন্তু সে কাজগুলোর খুব বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেত না। উপযুক্ত মূল্য মিলত না। তাছাড়া কাজের সুযোগও ছিল কম। টেইলার্সের কাজের ফাঁকে আরও কিছু করার কথা ভাবলেন। তাই এলাকার 'গ্রীনলিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল' নামে একটি স্কুলে যোগাযোগ করেন। স্কুলের কর্তৃপক্ষ তাকে সুযোগ দেন শিক্ষকতার জন্য। ২০০৪ সালে শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন পাপলী মাসিক ছয়শত টাকা বেতনে। সেখানে তিনি শ্রেষ্ঠ শিক্ষয়ত্রীর সম্মানটি পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন।

শিক্ষকতার জীবনের সাথে ভাবলেন আরও একটু ভাল বেতনের কর্মসুযোগের। ভাবনার সাথে বাস্তবতা মিলে যায়। ফলে কর্মসুযোগ ঘটে 'মানবী' নামে একটি মহিলা সংগঠনে। ২০০৫ সালে ১২ ফেব্রুয়ারি 'মানবী'তে কাজ শুরু করেন। এখানে শিক্ষানবিশ ভাতা হিসেবে মাসিক দু'হাজার টাকা বেতনে বর্তমানে কর্মরত আছেন। 'মানবী'তে তিনি সার্বিক ব্যবস্থপনার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। মানবী আবাসিক হোস্টেল, পার্লার, সমিতি, গ্রন্থাগারসহ এর বহুমুখী কার্যক্রমে তিনি সহায়তা করে থাকেন। কর্মস্থলে নিজ দায়িত্ব পালনের একঘেয়েমী জীবন কেমন যেন দুর্বিষহ মনে হচ্ছিল। কোন কিছুতেই তার ভাল লাগছিল না। সব ছেড়ে গ্রামে চলে যাওয়ার কথা ভাবলেন এবং সেখানে গিয়ে কিছু করবেন। কিন্তু তেমন ভাবনা কেবল স্বপ্নেই থাকে। কারণ সে পথ অত সহজ নয়।

জীবনের বহু চড়াই উৎরায়ের পথ পাড়ি দিয়ে পাপলীর এই যে এগিয়ে চলা এর পেছনের কারণটি ছিল নিজের আত্মশক্তির শ্রেষ্ঠ গুণ সেই সাথে তা বাস্তবায়নের জন্য 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণটি। ২০০৫ সালের জুন মাস, ৬৮২তম ব্যাচে চার দিনের উজ্জীবক প্রশিক্ষণটি বদলে দেয় পাপলীর জীবনধারা। 'মানবী'র পক্ষ থেকে চার জন কর্মীকে এই প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়েছিল। উজ্জীবক প্রশিক্ষণ ছিল তার এক অজানা ভাল লাগা। পাপলীর ভাষায়, "প্রশিক্ষণে এত বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম যে বিগত জীবনের সকল দুঃখ ভুলে গিয়েছিলাম। মাত্র চার দিনে একজন মানুষ কত বদলে যেতে পারে আমি তার প্রমাণ। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হলাম।" মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি মুগ্ধ করে তাকে। প্রশিক্ষণ শেষে ১১ জনের একটি দল গঠন করে মিরপুর ১ ও ২ এর এলাকা প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়। উল্লেখ্য, মিরপুর এলাকার বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য এই দলটি গঠন করা হয়েছিল। যে যার পাড়া বা মহল্লায় নিজ উদ্যোগে কাজ শুরু করবে। সপ্তাহে বা মাসে এলাকার সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে

আলাপ আলোচনা হবে। প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার আনন্দ আমাকে অনেক দায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে 'মানবী'তে নিজ কাজের দায়িত্বের পাশাপাশি ১১ সদস্য থেকে নির্বাচিত এলাকা প্রতিনিধির দায়িত্বটিও পালন করেন। এই দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে তিনি যেন নিজেকেই খুঁজে পেলেন। ভবিষ্যতে অধিক সক্রিয়ভাবে কাজ করার ইচ্ছা তার রয়েছে। 'মানবী মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি' এর সম্পাদক সৈয়দ সাজেদা ইসলাম লুলার সাথে কথা বলে জানা গেল কর্মস্থলে তাহ্মিনা হক পাপলীর দায়িত্ব পালনের আন্তরিকতা। জানালেন, "পাপলীর প্রতিভা আছে, সে চেষ্টা করলে পারবে আরও ভাল কিছু করতে।"

আঘাতের এক একটা ঢেউ এসে অনেক কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেলেও ভাসিয়ে নিয়ে যায় নি কেবল একটি মূল্যবান জিনিস। বিশ্বাসের মহামূল্যবান সম্পদটি নিয়ে পাপলী এগিয়ে গেছেন এবং সে গুণটি নিয়েই আজ অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তার এই দৃষ্টান্ত স্থাপনের অনুপ্রেরণামূলক কাজের কথাগুলো জানতে গিয়ে যখন শুনছিলাম, "নারী নির্যাতনের বহুরূপ আছে, বিয়ে করে বৈধতার মাধ্যমে স্বামীর অধিকার নিয়ে নির্যাতন করে যায় আজীবন; মূল্যবান প্রাণকে পায়ের নীচে দেয়; অনেক ক্ষেত্রেই বলার সুযোগ থাকে না, শুধু মেনে নিতে হয়।" জীবনের কথাগুলো বলার সূত্রে অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে পাপলী বললেন, অনেক ভারী একটি পাথর ক্ষণিকের তরে নড়ল কিন্তু তাতে ভার কমল কী। এমন অনেক আগুন আছে যা নাড়া দিলে জ্বলে ভাল- বিস্মিত হয়ে গেলাম সাধারণ মানুষও অসাধারণ কথা বলতে পারে এই ভেবে। তাহ্মিনা হক পাপলীর মতে, আমার সর্বাঙ্গীন কামনা, 'দি হাঙ্গার প্রজেক্টে'র উজ্জবীবকগণ আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে তাদের কার্যক্রম দ্বারা জাতিকে স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

খুব বেশি বা বড় ধরনের কোন কাজ হয়তো পাপলীর নেই। কিন্তু পাপলী তার আত্মশক্তি এবং বিশ্বাস নিয়ে তিনি এগিয়ে এসেছেন সকল প্রতিবন্ধকতাকে পেছনে ফেলে। তার আত্মশক্তি এবং ইচ্ছশক্তি দিয়ে তিনি পারবেন অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতে এ বিশ্বাস আমাদেরও ঠিক তার মত। 'আত্মশক্তি' একটি বিশ্বাস, এই বিশ্বাসের গুণটি নিয়েই আমরা এগিয়ে যাব এবং সেই আত্মশক্তির সমৃদ্ধিই ঘুচিয়ে দেবে আমাদের জীবনের সকল সীমাবদ্ধতা।

আমার কথা: নীলিমা আক্তার চৌধুরী

সরস্বতী রানী পাল

৮ মার্চ জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আন্তর্জাতিক নারী দিবস নিয়ে আমরা বিভিন্ন সময়ে লিখে থাকি। নিউইয়র্কের পোশাক শিল্পের নারী শ্রমিকেরা ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ অকথ্য শোষণের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জানানোর জন্য রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। এই সংগ্রাম স্মরণ করার জন্য জার্মান সমাজতন্ত্রী নেত্রী ক্লারা জেৎকিন (Clara Zetkin) ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রী নারীদের সম্মেলনে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার প্রস্তাব করেন। ১৯১১ সালের ৮ মার্চ থেকে এই দিবসটি প্রতি বছর মর্যাদার সঙ্গে পালন করা শুরু হয়। ৮ মার্চ দিবসের কথা স্মরণ করে চট্টগ্রামের নারী নীলিমা আক্তার চৌধুরীর সংগ্রামী জীবনের কথা তুলে ধরছি। নীলিমা আক্তার চৌধুরীর কথা তুলে ধরব তাঁর নিজের ভাষায় "আমার কথা" শিরোনামে।

কোনোরূপ আভিধানিক বিশ্লেষণ ছাড়া এই মুহূর্তে সাধারণ চিত্রপটে যদি কল্পনা করা হয় একটি নারীরূপ; তাহলে ভেসে ওঠবে আমার মায়ের সেই মমতাময়ীর চিত্রখানি। 'নারী' এই শব্দটির মমতা, বাৎসল্য, রমণী সহ নানারূপ শাব্দিক অর্থ মনে আসা অমূলক কিছু নয়। আমি নীলিমা আক্তার, চট্টগ্রামের মেয়ে। 'আমার কথা' মানে হচ্ছে আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা, শৈশবের স্মৃতিময় দিনগুলো থেকে গতিশীল জীবনের কিছু কথা। আমার আমি। সেই আমি! যে আমি আমার মায়ের কোলে ছিলাম এবং সময়ের সোপান বেয়ে হয়ে ওঠেছি নীলিমা আক্তার চৌধুরী।

আমার কথা। প্রসঙ্গসূত্র ধরে নারী অর্থাৎ জগৎ সংসারে নারীর মূল্য বিষয়ে একটু কথোপকথন হতে পারে অনেকের সাথে আমার। মনে পড়ছে সেই স্কুল জীবনের কথা। পাঠ্যসূচির একটি প্রবন্ধে পড়েছিলাম, নারীত্বের মূল্য কি? সে কথা পৃথিবীর ইতিহাস খুলে প্রমাণ করা অসম্ভব কিছু নয়। ইতিহাসের পাতা থেকে জীবন খাতার পাতা উল্টালেই কিছু স্মৃতি, কিছু ঘটনা আজও কল্পনাতীত মনে হয়। অথচ একটা সময় ছিল, যখন এসবই ছিল সত্য এবং বাস্তব ঘটনা; যা আমার আমি হয়ে ওঠার পেছনের কিছু কথা। স্কুল জীবনের পাঠ্যসূচির সেই প্রবন্ধের অর্থ তখন বুঝতে পারি নি। কিন্তু জীবন নদীর বাঁক দীর্ঘতর হতে হতে মনে হয়েছে তার অর্থ কত গুরুতর এবং ভয়ঙ্কর। আমার জীবন শুরু হয়েছিল আর সব স্বাভাবিক কন্যাশিশুর মত। পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ ছিলাম বলে শৈশবে অনেক আদর আর ভালবাসায় ধন্য হয়েছিলাম।

শৈশবের কথা

পিতা মফিজুর রহমান চৌধুরী ও মাতা কুলসুম নাহার বেগমের আট সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তান আমি নীলিমা আক্তার চৌধুরী। জন্ম ১৯৭৬ সালের ৫ আগস্ট চট্টগ্রামের রশিদনগর ইউনিয়নের মফিজাবাদ গ্রামে। শৈশবের দূরন্তপনার সুন্দর দিনগুলো কেটেছে মফিজাবাদ গ্রামে। স্বভাব দূরন্ত প্রকৃতির ছিল বলে গ্রামবাসীর অনেক অভিযোগ ছিল আমাকে নিয়ে। স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান হলেও খেলার সাথীরা ছিল গ্রামের দরিদ্র্য শিশু। মানুষের অভাব অনটন ব্যথিত করত খুব বেশি। নিজের ঘরে মজুদ থাকা খাদ্য সামগ্রী যেমন, চাউল, ডাল, পেঁয়াজ, চিনি লুকিয়ে বিলি করতাম অসহায় দরিদ্র্য বন্ধুদের মাঝে। কখনো কখনো হাতেনাতে ধরা পড়ে যেতে হতো মা-বোনদের কাছে। সে এক বিব্রতকর অবস্থা। তবুও ভাল লাগত। কারণ খেলার সাথীদের জন্য কিছু করতে পারতাম বলে এক ধরনের আনন্দ অনুভূত হত।

বেড়ে ওঠা ও শিক্ষাজীবন

হাতে খড়ি হয়েছিল পরিবারেই। গ্রামের পাঠশালায় প্রথম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার সুযোগ হয়েছিল। বাবার ইচ্ছায় এক সময়ে গ্রামের দূরন্তপনার অধ্যায় শেষ করে মেজ ভাই-ভাবীর হাত ধরে চলে আসতে হয়েছিল চট্টগ্রামের ইট, কাঠ-কংক্রিটের শহরে। এখানে শিশুবাগ স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করান আমার মেঝ ভাই। এরপর ডা. খাস্তগীর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৯৩ সালে এসএসসি এবং এনায়েত বাজার মহিলা কলেজ থেকে ১৯৯৫ সালে এইচএসসি পাশ করে এই কলেজে

বিএ শ্রেণিতে ভর্তির সুযোগ ঘটে। ১৯৯৭ সালে বিএ পাশ করি। ততদিনে মাথার ভিতরে স্বাবলম্বী হওয়ার ভাবনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। প্রতি মুহূর্তে মনে হত কিছু একটা করা একান্ত প্রয়োজন।

পরিবার পরিজন ও বিবাহিত জীবন

স্বাভাবিক নিয়মে স্কুল জীবন চলছিল। কিন্তু সময়ের ধারাবাহিকতায় নয়, বরং সময়ের এক অপ্রত্যাশিত নিয়মেই আমার বিয়ে হয়েছিল যখন আমি নবম শ্রেণিতে পড়ি। বিয়ের কিছুদিন পরেই আমি বুঝতে পারলাম আমার স্বামী নেশাগ্রস্ত এবং বেকার। প্রায় দিন ঘুম থেকে ওঠে অকারণেই মারধর শুরু করে দিতেন। আমি আমার অপরাধ বুঝতে পারতাম না। সবসময় নীরবতা পালন করতাম। এই নীরবতার মাঝে সময় গড়াতে থাকে। এক সময় আমার শরীরে নতুন প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করলাম। ধীরে ধীরে সে বেড়ে উঠলো, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই আমার সন্তানটি যথাসময়ে জন্ম নিল। কিন্তু সে জন্মগ্রহণ করল একটু অসুস্থাবস্থায়, দুর্বল পা নিয়ে। শিশু সন্তানটি যখন বড় হচ্ছে আমি সর্বস্ব দিয়ে তার চিকিৎসা করছিলাম। আমার বেকার স্বামী প্রতিদিন গভীর রাতে নেশাগ্রস্ত হয়ে ঘরে ফিরতেন। ঘুম থেকে ওঠতেন দুপুর ১২ টায়, এরপর নাস্তার টেবিলে বসে চিৎকার, চেঁচামেচি করতেন এবং তার সঙ্গে উপড়ি পাওনা হিসেবে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতাম।

পৈত্রিকসূত্রে পাওয়া সম্পদের মাসিক আয় দিয়ে ছেলের চিকিৎসা ঠিকমতো করানো সম্ভব হচ্ছিল না। এরূপ পরিস্থিতিতে নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করলাম। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে যোগাযোগ করি। এখানে হস্তশিল্পের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করলাম। কিন্তু প্রশিক্ষণের ব্যাপারে পরিবার থেকে কোনোরূপ সহযোগিতা পাওয়ার সুযোগ ঘটে নি। প্রশিক্ষণের বিষয়টি নিয়ে পরিবারে দেখা দিল চরম অশান্তি। নানারূপ জটিলতায় এক পর্যায়ে আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। এ উদ্যোগটি নেওয়ার পর শুধুমাত্র মা ও বোনদের ছাড়া পরিবারের অন্য কারো সহযোগিতা পাই নি। এমনকি সামাজিকভাবেও কোন সহযোগিতা পাই নি। পরিবার যা মেনে নিতে পারে নি তা সমাজও পারল না। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমার মনোবল ভেঙে যায় নি। তাই স্বাভাবিকভাবে সব কিছু মেনে নিয়েই আমি আমার মতো করে এগিয়ে যেতে শুরু করলাম।

হয়ে ওঠা জীবনের কথা

আমি বিশ্বাস করি আত্মবিশ্বাস, কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যবসায় মানুষকে নিয়ে যেতে পারে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে। এ বিশ্বাস থেকে আমার পথ চলা শুরু। ছোট বেলায় সফল বাবাকে দেখে আমারও ইচ্ছে হতো বাবার মতো একদিন সমাজের নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলার। নিজেকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন করার ইচ্ছা আমাকে নিয়ে গেলো যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে। প্রশিক্ষণে অর্জিত দক্ষতা এবং আপন মেধা নিয়ে বহু বাধা বিপত্তি, চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে হয়েছে সমাজের নির্যাতিত, নিষ্পেষিত সুবিধা বঞ্চিত দুঃখী মানুষদের কাছে। এরপর তাদের কথা ভেবে একটি সংগঠন তৈরি করার কথা চিন্তা করতে শুরু করি।

'অগ্রযাত্রা'- এর অগ্রকথা

আমার স্বপ্নীল জীবনের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যাংক ঋণ নিয়ে ১৯৯৮ সালের ১৫ নভেম্বর তারিখে প্রতিষ্ঠা করি 'অগ্রযাত্রা' নামক সংগঠন। চট্টগ্রামের জামাল খান রোডে অবস্থিত এই সংগঠনের কার্যক্রম শুরু হয় বেকার মহিলাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের শো-পিস, ব্লক-বাটিক, এমবুশ, হাজার বুটিক, জারদৌসি, চুমকি প্রিন্ট, মোম বাটিক, হাতের কাজ, কনফেকশনারি প্রশিক্ষণ দেওয়া। প্রশিক্ষণ শেষে বেকার মহিলাদের ঘরে ঘরে গিয়ে হাতের কাজের অর্ডার দেওয়ার ফলে বহু মহিলা রপ্তানীজাত পণ্যের উপর কাজ করতে উৎসাহিত হয়। এর মধ্যে বিভিন্ন গার্মেন্টস ও বায়িং হাউজের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করার মাধ্যমে রপ্তানীযোগ্য কিছু হাতের কাজের অর্ডার পাই। হাতের কাজের অর্ডারগুলো চীন এবং ভারত থেকে আমদানী করা হতো। আমার চেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের ফলে উক্ত হাতের কাজের টেকনিকগুলো রপ্ত করে মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে প্রায় চার হাজার মহিলাকে দক্ষ মহিলা হিসেবে গড়ে তুলেছি;

যারা আজ রপ্তানীযোগ্য গার্মেন্টস পণ্যগুলো তৈরি করে দেশের জন্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি নিজেরা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সক্ষম হয়েছেন।

'অগ্রযাত্রা' প্রতিষ্ঠানটি এখন সমাজ সেবা অধিদপ্তর ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিবন্ধিত। প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে এইডস সচেতনতায়, কাজ করছে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে। এছাড়া নানা প্রকার সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত রয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। বিভিন্ন এনজিও-এর সাথে চুক্তিভিত্তিক কাজ করে থাকে এই 'অগ্রযাত্রা'।

'অগ্রযাত্রা'র ব্যতিক্রমি কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে, আমার প্রতিষ্ঠানটিতে দশ জন প্রতিবন্ধী দরিদ্র অসহায় নারী নিয়োগ পেয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গার্মেন্টস শিল্প একটি ক্রমবর্ধমান শিল্প। এই শিল্পের সাথে হাতের কাজের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হওয়ায় আমার এই প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যত অত্যন্ত উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময়। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার পাঁচটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

অগ্রযাত্রা এবং আমি

নিজে আত্মনির্ভরশীল হওয়া এবং অন্যকে স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা আমার লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দিলে অন্যের স্বনির্ভরতা অর্জনের চিত্রটি সহজ হতে পারে:

লাকী আক্তার ও তার পরিবার চট্টগ্রামের সিমেন্স হোস্টেল এলাকায় বাস করে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছয়। ঘরে বৃদ্ধ বেকার মা বাবা, সাথে দুই ভাই বেকার। অত্যন্ত কষ্টের সংসার। আর্থিক অনটনের কারণে সংসার যেন চলছে না। লাকী আক্তারকে সহযোগিতার জন্য আমার কাছে আসলে আমি তাকে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে বলি এবং সে আমার কথা মত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শেষে সে চল্লিশ জন কর্মীর একটি দল গঠন করে এবং এই দলকে হাতের কাজ করায়। লাকী এবং তার দলের সদস্যগণ এখন প্রতি মাসে প্রায় এক লক্ষ টাকার হাতের কাজ করে। আজ তারা স্বনির্ভর। লাকী আক্তার হাতের কাজ করার কারণে বিভিন্ন দেশীয় বিক্রয় কেন্দ্র তাকে অর্ডার প্রদান করছে। তার উৎপাদিত পণ্য দেশে এবং বিদেশে বিক্রয় হচ্ছে। এভাবে সে স্বনির্ভরতা অর্জন করার পাশাপাশি আরো ষাট জন যুব মহিলাকে সম্মানজনক পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের পথ করে দিয়েছেন।

অগ্রযাত্রার সাথে যুক্ত হয়েছে 'ইরেক্ট' নামক আরও একটি কার্যক্রম

অগ্রযাত্রার অগ্রণী কর্মপরিধি বিস্তৃতির সাথে সাথে গড়ে উঠেছে 'ইরেক্ট' নামে আরও একটি বহুমুখী প্রতিষ্ঠান। ইরেক্ট নামে এই বহুমুখী প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ড এখন অনেক বিস্তৃত। কম্পিউটার ও সেলাই প্রশিক্ষণ ছাড়াও এখানে আরো যেসব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেগুলো হলো ক্রে-ক্রাপট, বনসাই, মণ্ডের শোপিস, মার্বেল-প্রিন্ট, কনফেকশনারি, চাইনিজ রান্না, ক্রীণ-প্রিন্ট, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রশিক্ষণ, ক্রিস্টাল, সিরামিক, গ্লস-সিনারী, প্ল্যাস্টিক-ফাইবার, ফুল তৈরি, ভেজিটেবল-ডায়িং প্রশিক্ষণ। পাশাপাশি এর সাথে যুক্ত হয়েছে একটি বিউটি পার্লার। এই বিউটি পার্লারটি আবার বিএমএ- এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মহিলা ক্যাডেটদের চুল কাটানোর জন্য। মহিলারা এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়ে অনায়াসে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের সুযোগ বিনামূল্যে নিতে পারেন। নিয়মিত কাজের অর্ডার নিয়ে উপার্জনের পথে পা বাড়াতে পারেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে বেতনভোগী কর্মচারী রয়েছে ৩০ জন, ফিল্ড সুপার ভাইজার ৬৫ জন আর মেম্বার হয়েছেন ১৫০০ জন মহিলা। এ ছাড়া এই প্রতিষ্ঠান থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন প্রায় ৪৫০০ জন। তাদের বেশীর ভাগ নানাভাবে উপার্জন করে সফল হয়েছেন। যারা এখান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, তাদেরকে বিভিন্ন কাজের অর্ডার এখান থেকে দেওয়া হয়।

'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ'র কার্যক্রমে আমার অংশগ্রহণ

১০৭৫তম ব্যাচে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ' পরিচালিত উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করি। প্রশিক্ষণটি আমার অনেক পুরনো ভাবনাকে বদলে দেয়। এতদিন যে আত্মনির্ভরতার কথা ভাবতাম তা শুধু নিজের জন্য নয়; সামগ্রিকভাবে সবার জন্য। অনেককে সাথে নিয়ে এতদিন যে কাজগুলো করছিলাম আমার 'অগ্রযাত্রা' সংগঠনের মাধ্যমে তার আরও বিস্তৃত ঘটবে বলে আশা করছি। চারদিনের মূল্যায়ন পর্বে একথাটি জানাতে পেরে ভাল লাগছিল। প্রশিক্ষণের অর্জন জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত হল। স্বনির্ভরতার জন্য সবাইকে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা থাকবে প্রতিমুহূর্তে।

জীবনের জন্য লড়াই

অনেক কিছু হওয়ার স্বপ্ন নয় শুধু ভাল একজন মানুষ হতে চেয়েছি ঠিক আমার বাবার মত। গর্বিত পিতার সন্তান হতে চেয়েছি বাবার আদর্শে মানুষ হতে। সুদীর্ঘ আঠার বছর আমার বাবা মফিজুর রহমান চৌধুরী ছিলেন মফিজাবাদ গ্রামের একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং রশিদনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। সেই সূত্র ধরে আমার পথ চলা এবং এগিয়ে যাওয়া। বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম এবং সে সংগ্রাম জীবনের জন্য লড়াই। জীবনের সবচেয়ে দুঃখের ঘটনা বাবার মৃত্যু। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় বাবাকে হারিয়েছি। বাবা খুব বেশি স্নেহ করতেন বলে বাবার অভাব বেশি অনুভূত হয়। মা সবসময় উৎসাহ দিতেন, আগলে রাখতেন স্নেহ মমতায়। এইসব ব্যস্ততার মাঝে মায়ের স্মৃতি মনে পড়ে।

জীবনের জন্য লড়াই শুধু আমার নয়। অন্য সকল নারীর জন্য এই লড়াই। মেয়েরা কাজ করতে আগ্রহী হলেও বিভিন্ন বাধার কারণে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অনেক কর্মী বাড়ি থেকে বাইরে আসা-যাওয়ার ঝামেলা হয়। ফলে মেয়েদের উপার্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই আমি আমার প্রতিষ্ঠান 'অগ্রযাত্রা' এবং 'ইরেক্ট' থেকে লোক পাঠিয়ে বাড়ি বাড়ি কাজের অর্ডার পৌঁছে দিয়ে আসি, কাজ শেষে আবার সেই মালামাল নিয়ে আসা হয় প্রাপ্য টাকাটাও বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হয়।

পুরস্কার ও সম্মাননা

চট্টগ্রাম বিভাগের শ্রেষ্ঠ যুব মহিলা আত্মকর্মী হিসেবে জাতীয় যুব পুরস্কার পাওয়াটা আমার জীবনে সবচেয়ে সুখের ঘটনা। 'অগ্রযাত্রা'র বিভিন্ন রকমের উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সংস্থাটির সভাপতি হিসাবে আমাকে 'জাতীয় যুব পুরস্কার ২০০৫' এ ভূষিত করেছেন। নীলিমা আকতার চৌধুরী এই সাফল্যের নামটি 'অগ্রযাত্রা'র সাথে যুক্ত করতে পেরে গর্ববোধ করছি। গত ২৯ ডিসেম্বর ২০০৫ ঢাকার শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে এই পদক গ্রহণ করার সুযোগ ঘটে। এছাড়া আমি চট্টগ্রামের মহিলা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সংগঠন 'উইমেন এন্টারপ্রেনিয়ার্স' এর পক্ষ থেকে ৮ মার্চ ২০০৬ সমাজসেবায় অনন্য অবদানের জন্য বিশেষ 'সম্মাননা' অর্জন করি।

গতিশীলতাই জীবন

নিজের সাফল্যের কারণে, বর্তমান অবস্থানের কারণে পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে আমার মর্যাদা বেড়েছে। এখন সবাই প্রশংসা করে আমার কাজের। আমার স্বপ্ন দেশের অনগ্রসর নারী গোষ্ঠীর জন্য কল্যাণকর কিছু কাজ করার। বিশেষত মফিজাবাদ গ্রামের অসচেতন, অস্বচ্ছল মেয়েদের জন্য কিছু করার ইচ্ছা রয়েছে। তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে উপার্জন করাসহ

নানা বিষয়ে তাদেরকে সচেতন করার জন্য কাজ করব। স্বাস্থ্য, শিক্ষা বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ে একটা কমপ্লেক্স গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে। আমাদের দেশের বৃদ্ধ মানুষদের অসহায়ত্ব খুব পীড়া দেয়। সেজন্য স্বপ্ন দেখি একটি 'বৃদ্ধাশ্রম' (old Home) প্রতিষ্ঠার। যেখানে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা নিরাপদ নিশ্চিত আশ্রয় পাবেন। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা এবং দাতা সংস্থার অনুদান।

ভবিষ্যত ভাবনা

আমার প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও এলাকার জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টা করব। ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক, সহযোগিতা, সমঝোতা, মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার চেষ্টা করব। বেকার জনগোষ্ঠীকে আত্ম-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে বেকার মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই, বাটিক, দর্জি, কাঁথা, বুনন, হস্ত শিল্প, বাঁশ-বেত, হাঁস মুরগি পালন, পশু পালন, মৎস্য চাষ, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদির প্রশিক্ষণ দিয়ে বাড়িতে বসে আয়ের পথ সুগম করব। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এক লক্ষ বেকার ও দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এভাবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করব। একটি বায়িং হাইজ প্রতিষ্ঠা করা যায়, যার মাধ্যমে আমি নিজে বিদেশে পণ্য রপ্তানী করতে পারি।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে ব্যাপকভাবে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি, গাছের চারা উৎপাদনের জন্য নার্সারি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। স্বামী পরিত্যক্ত, এতিম, দুঃস্থ, অসহায় মেয়েদের সহযোগিতা প্রদান করা। বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথা রোধ করা এবং মহিলাদের আইনগত সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা। এইচআইভি ভাইরাসের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা। গণশিক্ষা চালু করে শিশু কিশোর ও বয়স্কদের শিক্ষা দানের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক ভাতা চালু করা। স্বল্প মুনাফায় মাইক্রো ফাইন্যান্স চালু করা যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত পরিবারকে আর্থিকভাবে স্বর্য়ং সম্পূর্ণ করা।

'আমার কথা'র আমার আমি

আমার কাছে আমার পরিবার এবং উদ্যোগ দুইটি প্রতিষ্ঠানের মতো। দুইটিই গুরুত্বপূর্ণ এবং সমমর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। আমি আমার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের কারণে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত জীবনযাপন করতে পছন্দ করি। যার ফলে আমার পরিবার এবং উদ্যোগ পরিচালিত হয় একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মে। সমাজের অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় আমি আত্মনির্ভরশীল। পারিবারিকভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আমার রয়েছে। কিন্তু সমাজের অন্যান্য নারী সর্বদা নিজের সংসারের কাজ করেও নিজ সংসারে সবসময় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তাদের থাকে না। সর্বোপরি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তারা পরনির্ভরশীল বলে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। কিন্তু আমার বেলায় তা প্রযোজ্য নয়। আমার সংসারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে প্রতিমুহূর্তেই। সবচেয়ে ভাললাগা হল, আমি পরনির্ভরশীল নই। আর সবার থেকে আলাদা একটি সুন্দর এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ জীবনযাপন করা সম্ভব হয়েছে স্বনির্ভরতা অর্জনের মধ্য দিয়ে।

এভাবেই আমি হয়ে উঠলাম নীলিমা আক্তার চৌধুরী। আর এই হচ্ছে "আমার কথা" এর এক জীবনে আমার আমি হয়ে উঠার গল্প।

শেষ কথা

'আমার কথা'-এর গল্পের চট্টগ্রামের নীলিমা আক্তার চৌধুরীর নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এক জীবনে হয়ে উঠার সত্যিকার কথাগুলো সবাইকে জানাতে পেরে আমারও ভাল লাগছে। ঘটনাবহুল ব্যতিক্রমি এই জীবনচিত্র সত্যিই বিস্ময়ের। নীলিমা চৌধুরীর কাজকর্মের গতিশীল প্রক্রিয়াই প্রমাণ করে কতটা প্রত্যাশা তার। সে প্রত্যাশা তার নিজের কাছে। নিজের সঞ্চয়, সামর্থ্য আর অক্লান্ত পরিশ্রমের গুণটি দিয়ে নিজের প্রত্যাশটুকু পূরণ করবেন। সাক্ষাৎকারে বেশ কিছুটা সময় গড়ালে সময় সচেতন মানুষটি জানতে চাইলেন আর কতটুকু বাকি। এরপর একজন কর্মনিষ্ঠ মানুষকে তার জগতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিতে হল। নীলিমা আক্তার চৌধুরী ফিরে গেলেন তার নিজ গন্তব্যে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস নিয়ে বিভিন্ন সময়ে লেখার সূত্র ধরেই চট্টগ্রামের মফিজাবাদ গ্রামের সংগ্রামী নারী নীলিমা আক্তার চৌধুরীর কথা তুলে ধরা। ৮ মার্চ জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক নারী দিবসের বিশেষ দিনের জন্য এই নারীর জীবনচিত্রের গল্প।